হিন্দু-দর্শন।

[হাওড়ার "সাহিত্য-সম্মিলনে"

"বেদান্ত-দর্শন"

সম্বন্ধে বক্তৃতা।]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ

মহাশয়ের লিখিত [illegible]

"সাহিত্য-সম্মিলন।'

হাওড়া।

৬৫নং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, হাওড়া
‘পৃথিবীর ইতিহাস’ প্রেণ্টিং ওয়ার্কস মুদ্রাযন্ত্রে—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক—
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদন

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয়, হাওড়ার "সাহিত্য-সম্মিলনে" 'বেদান্ত-দর্শন' বিষয়ে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হন; এবং তাঁহার সেই ধারা-বাহিক বক্তৃতার মর্ম্ম তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য 'সাহিত্য-সম্মিলনকে' দান করিবেন—স্থির হয়।

তাঁহার সেই মনোমদ মধুর বক্তৃতা যিনিই শুনিয়াছিলেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার সেই বক্তৃতার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাই এই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। এ পুস্তিকা যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের এই বক্তৃতার জন্য হাওড়ার 'সাহিত্য-সম্মিলন' তাঁহাকে এক শত টাকা প্রণামী প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এখন, তাঁহার এই গ্রন্থরত্নের স্বত্ব-স্বামিত্ব হাওড়ার "সাহিত্য-সম্মিলনকে" দান করিয়া আশীর্ব্বাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার এই আশীর্ব্বাদে হাওড়ার 'সাহিত্য-সম্মিলন' তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিল। ইতি ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৫ সাল।

"সাহিত্য-সম্মিলন।"
(ডিউক লাইব্রেরী।)
হাওড়া।

নিবেদক
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী (শর্ম্মা)।
'সাহিত্য-সম্মিলনের' সম্পাদক।

বেদান্ত-দর্শন যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদান্তশাস্ত্র এতই বিস্তৃত ও বহুশাখায় প্রবিভক্ত যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সমুদয়ের সম্পূর্ণ-ভাবে আলোচনা বা সে সকলের বিষয়-বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক বর্ণনা করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; সেই কারণে বেদান্ত-সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ-সকল কেবল এখানে আলোচনার্থ উপস্থাপিত করিব; এবং সম্ভবপর হইলে অপরাপর বিষয়েরও অবতারণা করিতে ত্রুটি করিব না।

হিন্দু-দর্শন।

সূচনা।

কোনও দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই দর্শনের স্বরূপ, লক্ষ্য ও প্রয়োজন, এই তিনটী বিষয় উত্তমরূপে নিরূপণ করার আবশ্যক হয়; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল বিষয়ের পূর্ণমাত্রায় আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। এই কারণে এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপতঃ ঐ তিনটী বিষয়ের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিব।

* * *

দর্শনের স্বরূপ বা পরিচয়।

দর্শন শব্দের যৌগিকার্থ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, 'দর্শন' শব্দটী 'দৃশ্‌' ধাতু হইতে করণবাচ্যে অনট্‌ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্‌ ধাতুর সহজ অর্থ—প্রেক্ষণ। 'প্রেক্ষণ' শব্দের অর্থ চাক্ষুষ জ্ঞান—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা। কিন্তু ব্যবহার-দৃষ্টে জানা যায় যে, কেবল চাক্ষুষ জ্ঞানই উহার একমাত্র অর্থ নহে, পরন্তু জ্ঞানমাত্রও উহার অপর একটী অর্থ।

ইহা আধুনিক কল্পনাপ্রসূত কথা নহে। প্রাচীন বৈয়াকরণ পণ্ডিত-গণও এইরূপ অর্থ অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারাও 'দৃশেরপি জ্ঞানবচনত্বাৎ' বলিয়া দৃশ্ ধাতুর সাধারণ জ্ঞানার্থতায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং দৃশ্ ধাতুর জ্ঞানার্থতা কল্পনা অনুচিত বা অপ্রামাণিক হইতে পারে না। অতএব 'দর্শন' শব্দের এরূপ অর্থ করা অসঙ্গত হইবে না যে, যাহা জ্ঞানসাধন অর্থাৎ মানুষ যাহার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে, তাহার নাম—দর্শন। ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ তথাবিধ জ্ঞানলাভে সহায়তা করে; এই জন্য ঐ সকল শাস্ত্র 'দর্শন' নামে পরিচিত।

এখানে বলা আবশ্যক যে, যদিও উল্লিখিত যৌগিকার্থানুসারে জ্ঞানসাধন শাস্ত্রমাত্রই দর্শন নামে পরিচিত হইবার যোগ্য হইতে পারে সত্য; তথাপি ভারতীয় আচার্য্যগণ এস্থলে তাদৃশ উদার অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন,—জ্ঞান-সাধন শাস্ত্রমাত্রই দর্শন মধ্যে পরিগণনীয় নহে; পরন্তু যে সকল শাস্ত্রের উপদেশ বলে, জীব জগৎ বা আত্মা ও অনাত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারা যায়, এবং বন্ধ মোক্ষ ও তাহার উপায় সকল অবধারণ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রের সাহায্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় ভ্রমপ্রমাদশূন্য নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়, কেবল সেই সকল শাস্ত্রই দর্শন নামে পরিগণিত হইবার যোগ্য। প্রচলৎ ন্যায়-বৈশেষিকাদি শাস্ত্রই ঐ প্রকার জ্ঞানোৎ-পাদনের প্রকৃষ্ট সাধন। এইজন্য ঐ সকল শাস্ত্র 'দর্শন' নামে পরিগণিত ও আদৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন,—প্রসিদ্ধ নাস্তিক সম্প্রদায়ই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে দর্শন শব্দের প্রথম

প্রবর্ত্তকও তাঁহারাই। কারণ, নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অপর কোনও প্রমাণের অস্তিত্ব বা উপযোগিতা মোটেই স্বীকার করেন না, এবং স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করেন না। সর্ব্ববাদিসম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যেই সর্ব্ববিধ জাগতিক ব্যবহার নির্ব্বাহের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার। তন্মধ্যে চক্ষুদ্বারা যে প্রত্যক্ষ নিষ্পন্ন হয়, সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই সাধারণতঃ নির্দ্দোষ ও সত্যগ্রাহী; এই জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। সেই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ-মূলক তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রথমে 'দর্শন' নামে অভিহিত হইত; পরে গতানুগতিক নিয়মে আস্তিক পণ্ডিতগণের বিচারমূলক সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসমূহও 'দর্শন' নামে পরিচিত হইতে লাগিল। ইঁহাদের মতে নাস্তিক সম্প্রদায়ই প্রথমে দর্শন শব্দের ও দর্শন শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, পরে নাস্তিক মতবাদের খণ্ডনোদ্দেশ্যে বিরচিত আস্তিক দর্শনগুলির আবির্ভাব হয়।

প্রকৃতপক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষ বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ উল্লিখিত কল্পনার অনুকূলে যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে এ কথার বিপক্ষে অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন প্রামাণিক শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আত্মদর্শনই প্রচলিত দর্শন শব্দের মুখ্য অর্থ। সেই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ করিতেন। প্রসিদ্ধ ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রগুলিও আত্মদর্শনোদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই 'দর্শন' নামে অভিহিত হইয়াছে। দেখা যায়, প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ শাস্ত্রগুলি আত্মদর্শনবিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ এবং তাহারই

অলৌকিক মহিমাময় গুণকীর্ত্তনে ব্যাপৃত। তদনুসারে অনুমান করা যাইতে পারে যে, চার্ব্বাক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে বৈদিক উপনিষদ্ শাস্ত্রই এদেশে আত্মদর্শনের কথা জনসমাজে সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করে। পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ উপনিষদ্ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গপুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ নামে একটী প্রকরণ আছে। সেখানে দেখা যায়, অশেষ জ্ঞাননিধি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় পত্নীদ্বয়কে নিজ সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি আপনার বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রশ্নোত্তর দান প্রসঙ্গে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে,— মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে অর্থাৎ মনুষ্যকে আপনার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিবে।

উক্ত বাক্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই আত্মদর্শনের উপদেশ করিয়াছেন; পরে তাহারই উপায়রূপে ক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের আদেশ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমতঃ বেদ ও আচার্য্য বাক্য হইতে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রুতি বিষয়ে সংশয় ও বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে বা হইতে পারে। যতক্ষণ সেই সংশয় ও ভ্রান্ত-জ্ঞান অপনীত না হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না; সুতরাং তদ্বিষয় নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করা সম্ভবপর হয় না।

সেই কারণে শ্রুত বিষয়ে মনন করার আবশ্যক হয়। মনন অর্থই যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে সমুৎপন্ন সংশয়াদি নিরসন পূর্ব্বক শ্রুত বিষয়ের সত্যতাবধারণ। অনন্তর সাক্ষাৎকারের উপযোগী ধ্যান (আত্মচিন্তা) করিতে হয়। একাগ্রতা-সহকারে আত্মতত্ত্ব চিন্তাই এখানে নিদিধ্যাসন কথার অর্থ।

উল্লিখিত উপনিষদ্বাক্যে আত্মদর্শনোপযোগী মননের উপদেশ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। মনন অর্থ যে উপযুক্ত যুক্তিতর্কসমন্বিত বিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ন্যায়-বৈশেষিকাদি গ্রন্থের কলেবরও ঐ জাতীয় যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ; মনে হয়, এই কারণেই ন্যায়-বৈশেষিকাদি শাস্ত্রসমূহ 'দর্শন' নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র যে আত্মদর্শনোপযোগী বিচার-বহুল, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক হইবে না যে, 'আত্মদর্শনই' 'দর্শন' শব্দের মৌলিক অর্থ। যে সমুদয় শাস্ত্র প্রধানতঃ সেই আত্ম-দর্শনের সহায়তা-কল্পে রচিত ও প্রচারিত, সে সমুদয় শাস্ত্রও 'দর্শন' নামে অভিহিত ও পরিচিত হইয়াছে। গোতম, কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ যে ছয়টী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব-নিরূপণে ব্যাপৃত। তজ্জন্যই উহারা 'দর্শন' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

দর্শন-শাস্ত্রের নামকরণ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। সে সকল কথার অবতারণা করিয়া পাঠক-বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ, দর্শন-শাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝিতে হয়, এদেশের শিক্ষিত সমাজ নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে সংশয়-রহিত। সুতরাং অকারণ অনুপযোগী বিষয়ের

আলোচনার দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত হয় না, এবং তাহা আমাদের লক্ষ্যও নহে। এ জন্য এখানেই এ কথা পরিসমাপ্ত করিয়া অন্য কথার অবতারণা করিতেছি।

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রচলিত ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রসমূহ দিব্যদর্শী আর্য্য-ঋষিবৃন্দের অদ্ভুত প্রতিভা ও অলৌকিক চিন্তা-শক্তির অপূর্ব্ব ফলস্বরূপ। ঐ সকল দর্শন-শাস্ত্র প্রচারিত হইয়া এদেশের বিদ্বৎসমাজে একপ্রকার অভিনব চিন্তার ধারা আনয়ন করিয়াছিল; এবং লোকচক্ষুর অগোচরে যে সকল দুর্ব্বিজ্ঞেয় সত্য বস্তু প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে, প্রস্তাবিত দর্শনশাস্ত্রই সে সকলের অনুসন্ধানোপযোগী নিষ্কণ্টক প্রশস্ত পথ প্রথমে প্রদর্শন করিয়াছিল। অধিকন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য বিষয়েও যে, নির্দ্দোষ তর্ক-যুক্তির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে, তাহাও আলোচ্য দর্শন-শাস্ত্র হইতেই উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে সত্য; তথাপি এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, দার্শনিক তর্ক-চিন্তার উপাদান সকল অতি পুরাতন—স্মরণাতীত সময় হইতে ঐ জাতীয় চিন্তাপদ্ধতি বিদ্বৎ-সমাজে আত্মলাভ করিয়াছিল। বিশাল বারিধি-বক্ষে নিরন্তর উত্থান-পতনশীল তরঙ্গমালার ন্যায়—বিচিত্র বিশ্ব-যন্ত্রের বিবর্ত্তন-ধারা ও কার্য্য-করণ-ভাব দর্শনের ফলে মনস্বী মানবমণ্ডলীর মানস মধ্যে অহরহঃ যে সকল চিন্তার তরঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবগণকে সমুচিত সুখ-দুঃখানুসন্ধানে ও হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহারে নিয়োজিত করে, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার প্রবর্ত্তক সেই সকল চিন্তার ধারাই প্রচলিত দর্শন-শাস্ত্রের বীজ বা প্রধান উপকরণ।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় স্মরণাতীত যুগেও যে এই জাতীয় চিন্তা-

বাজ বিদ্যমান ছিল, এবং সুধীসমাজে সমাদৃত ও উপাদেয় বোধে গৃহীত হইত, তাহার প্রভূত নিদর্শন আমরা প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাই। বৈদিক উপনিষদের মধ্যে ইহার প্রভূত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে প্রসিদ্ধ বেদশাস্ত্রকেই সমস্ত আস্তিক দর্শনের মূল ভিত্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। উপনিষদ্ গ্রন্থ যখন বেদেরই অংশবিশেষ, তখন উক্ত প্রকার অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

শ্রৌতশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি আপস্তম্ব বেদবিদ্যার পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং।"

অর্থাৎ,—মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ, এতদুভয়ের সম্মিলিত নাম—বেদ। সুতরাং 'বেদ' বলিলে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই উভয় ভাগই বুঝিতে হয়। বেদের মন্ত্রভাগ সাধারণতঃ সংহিতা ও কর্ম্মকাণ্ড নামে, আর ব্রাহ্মণ-ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ কথায় আদৌ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলেন, মন্ত্রময় সংহিতা-ভাগই প্রথমে বিরচিত হইয়াছিল; ঐ ভাগই যথার্থ 'বেদ' শব্দবাচ্য; পরে সমাজ-মধ্যে যেমন যেমন জ্ঞানালোক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তেমনি বেদানুসারে ক্রমশঃ সমুন্নত প্রণালীতে অধ্যাত্মচিন্তাপূর্ণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ প্রভৃতি সুচিন্তিত গ্রন্থরাশি বিরচিত ও প্রচারিত হইয়া প্রাচীন বেদ-শাস্ত্রের কুক্ষিগত হইয়াছিল। স্বকপোল-কল্পিত এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে তাঁহারা চতুর্যুগের অতিরিক্ত আরও কতকগুলি অভিনব যুগ কল্পনা করিয়া থাকেন। যেমন বৈদিক যুগ, আরণ্যক যুগ, সূত্রযুগ প্রভৃতি। এই সকল অভিনব যুগের কল্পনা করিয়া তাঁহারা

সরলচিত্ত মানবমণ্ডলীর হৃদয়মধ্যে এক বিস্ময়-রসের সঞ্চার করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গতানুগতিশীল অস্মদ্দেশীয় বহু-লোকও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। দুর্ভাগ্য-দোষে আমরা কিন্তু এ মতের অনু-মোদন করিতে পারি না। আমরা জানি, কালস্রোতের ন্যায় বেদবিদ্যাও চিরন্তন—অনাদি। ইহার গুরুশিষ্য-পারম্পর্য্য কখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেখানে যুগকল্পনার কোনও অবসরই নাই। একই বেদবিদ্যা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নামক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই সাধারণতঃ বেদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই সাদৃশ্য বশতঃ বেদ নিজেই নিজের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, এবং যে ভাগে সংহিতার রহস্য সকল বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ভাগ 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। সংহিতা-ভাগের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রকাশক ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যে যেমন সংহিতোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের কর্ত্তব্য প্রণালী প্রকটিত হইয়াছে, তেমনি জীব, জগৎ, বন্ধ, মোক্ষ ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতিও বিশেষভাবে বর্ণিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এইরূপ বিষয়ভেদে ও তাৎপর্য্যভেদে ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেও আরণ্যক ও উপ-নিষদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার আখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। একই উদ্দেশ্যে একই লোকের প্রণীত একই গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ বিষয়-ভেদানুসারে যেরূপ পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগ কল্পিত হইয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ একই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকটিত বহুশাখায় বিস্তীর্ণ একই বেদশাস্ত্র মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক দুইটা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ উহারা বিভিন্ন প্রকৃতির পৃথক্ শাস্ত্র নহে।

উপরিউক্ত বেদশাস্ত্রের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ উপনিষদ্‌ভাগের মধ্যে, আলোচ্য দার্শনিক চিন্তার উপকরণ-সমূহ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে দেখিতে পাই। উপনিষদের অধিকাংশ ভাগই দর্শনোচিত চিন্তায় পরিপূর্ণ, এবং প্রায় সমস্ত উপনিষদেই বিভিন্ন দর্শনের সূক্ষ্ম সূত্র-সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কথা সমর্থনের জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠক ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ প্রভৃতি অংশগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। তবে সময় ও সামাজিক অবস্থানুসারে সে সময়ে শ্রুত-সত্যতত্ত্ব-সমূহকে অকারণ কর্কশ তর্কের দ্বারা পরীক্ষা করিবার আবশ্যক ছিল না। তৎকালে শুদ্ধশান্ত সরলস্বভাব ভারতীয় নরনারীর হৃদয়াকাশে শান্তিময় শশধর চিরবিরাজমান ছিল, শান্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুধাস্বাদে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। তখন নাস্তিকতা-পিশাচী তাহাদের ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করিত না সকলেই পরমার্থ-সত্যাবেদক বেদবাক্যকে গুরুবাক্যের ন্যায় নিঃসংশয়চিত্তে পরমাদরে গ্রহণ করিত এবং তদনুসারে সাধন-পথে অগ্রসর হইত। সকলেই সেই বেদরূপ কল্পপাদপের শীতল ছায়ায় সমাসীন থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক শোকতাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিসুধাস্বাদে কৃতার্থতা লাভ করিত; সুতরাং সে সময়ে বর্ত্তমানকালীন কর্কশ তর্কপদ্ধতির অনুসরণ করিবার আবশ্যকতাই অনুভূত হইত না।

পরে যখন মহামহিম কালচক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, ভারতবাসীর সে সুখ-নিদ্রার অবসান হইল—দেখিতে দেখিতে সমস্ত সৎপথও যেন কলুষিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভারতবাসীর নির্ম্মল মানসাকাশে সংশয়-মেঘের সূক্ষ্ম রেখা প্রকটিত

হইল। বিতণ্ডাবাদরূপ বিষম বাত্যাসহযোগে সেই সূক্ষ্ম মেঘ-রেখাই বিষম জলদজালে পরিণত হইয়া দেশমধ্যে ঘোরতর দুর্দ্দিনের সঞ্চার করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতা-পিশাচীর তাণ্ডব লীলার আবির্ভাব হইল; প্রবল কুতর্কস্রোতে সনাতন ধর্ম্মসেতু বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল; অনাচার আবর্জ্জনায় চিরপরিচিত সৎপথ সকল পঙ্কিল ও দুর্গম হইয়া পড়িল, এবং শান্তশীল সাধুহৃদয়ও দিন দিন কুতর্ক-কালিমা-স্পর্শে মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। ফলে, জগন্মঙ্গলময় বিশাল বেদতরু তখন ছিন্ন-ভিন্ন বিপর্য্যস্ত হইয়া অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইল। এবংবিধ বিষম বিপর্য্যয় দর্শনে মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত-হৃদয় ঋষিসমাজ সমধিক ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, এবং সমবেত চেষ্টায় উপস্থিত বিপৎপ্রতিকারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই সর্ব্বানর্থের নিদান নাস্তিকতা নিরাসের নিমিত্ত, প্রতিপক্ষ-জয়ের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ দর্শন-শাস্ত্র-প্রণয়নে মনোযোগী হইলেন। ক্রমে গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বেদব্যাস—বেদের ধ্রুবসত্যতত্ত্বরাশি সুশৃঙ্খলভাবে যথানিয়মে সঙ্কলনপূর্ব্বক ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা নামে পৃথক্ পৃথক্ ছয়খানি উৎকৃষ্ট দর্শন-শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন।

ফলকথা, সমস্ত বেদে যাহা ছিল বা আছে, ষড়দর্শনে তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। বিশেষ এই যে, বেদে যাহা সংক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে ছিল, গোতমাদি ঋষিগণ সেই সমুদায় তত্ত্বই একত্রিত করিয়া বিস্তৃতভাবে সুশৃঙ্খলরূপে স্পষ্টভাষায় সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ তর্ক, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত ও সুব্যবস্থিত করিয়া, বিশ্বাসহীন তর্কপ্রিয় লোকদিগের সমক্ষে,

উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা অবৈদিক কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই।

একই প্রদেশ হইতে বিনির্গত পার্ব্বত্য নদীসকল যেমন বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন প্রকারে দূরদেশে প্রসৃত হইয়া এবং বিভিন্ন প্রকার নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াও মহাসমুদ্রে সম্মিলন বা আত্মসমর্পণরূপ প্রধান উদ্দেশ্য কেহই বিস্মৃত হয় না; তেমনি বেদশাস্ত্ররূপ একই মূলস্থান হইতে নিঃসৃত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহও নানা পথে, নানামতে বিভক্ত হইয়াও, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ চরম লক্ষ্য হইতে কেহই বিচ্যুত হয় নাই।

এখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গৌতম ও কণাদ প্রভৃতির প্রণীত ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় আত্মদর্শনের অনুকূল উপায় প্রদর্শক বলিয়া 'দর্শন' আখ্যা লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেও কে কবে কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে যে ঐ সমুদয় গ্রন্থের উপর 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই কঠিন। প্রাচীন আর্ষ-গ্রন্থে ঐরূপ অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যেও, একমাত্র জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকেই স্বীয় ভাষ্য মধ্যে স্থানে স্থানে 'দর্শন' শব্দের উল্লেখ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই 'দর্শন' শব্দের প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, পরে আস্তিক আচার্য্য-গণও গতানুগতিক-ন্যায়ে ঐরূপ অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণার ভার আমার সুযোগ্য পাঠকবর্গের উপরে সমর্পণ করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম।

* * *

হিন্দু-দর্শনের লক্ষ্য।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করা ও নীরস তর্কপরম্পরা শিক্ষার দ্বারা পরপক্ষ পরাজয়ের পথ প্রদর্শন করাই ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রসমূহের চরম লক্ষ্য। তদ্ভিন্ন দেশের কল্যাণকর দৈহিক বা মানসিক সমুন্নতি, কিংবা ধনাগমের উপায় চিন্তা ও শিল্পবাণিজ্যাদির সম্প্রসারণ, অথবা দুঃখ-দারিদ্র্য-নিবারণ সম্পর্কে কোনও প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করা হিন্দুদর্শনের চিন্তাপথেও স্থান লাভ করে নাই; সুতরাং ঐরূপ পরকালসর্ব্বস্ব দর্শন-শাস্ত্রগুলি দেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অনিষ্টকর। কাজেই ঐ জাতীয় তর্কসার শাস্ত্রসমূহের আলোচনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

এ কথার উপরে বলিতে হয় যে, আর্য্যঋষিগণ জানিয়া শুনিয়াই উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনায় মনঃসংযোগ করেন নাই। কেন না, তাঁহারা বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, জাগতিক সুখ-দুঃখ ও তদুপায় সকল চিরকাল একরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। যাহা একজনের পক্ষে পরমাদরের বস্তু, তাহাই আবার অপরের নিকট অনাদরে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রকার একই বস্তু কালভেদে একই ব্যক্তির নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়রূপে আদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অধিক কি, দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সমভাবে সকলের নিকট প্রিয় বা অপ্রিয়ভাবে গৃহীত হইতে পারে, —এরূপ বস্তু জগতে কোনকালে ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই এবং সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে না। এই কারণেই সদাশয় ঋষিগণ ঐ সমুদয় অনির্দ্দিষ্ট মুক্তি অভ্যুদয়ের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এমন

একটী বিষয়কে দর্শন-শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে আপামর সাধারণ কোনও লোকেরই বিপ্রতিপত্তি বা মতান্তর সম্ভবপর হয় না বা হইতে পারে না। সেই বিষয়টী আর কিছুই নহে,—জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি।

জগতে প্রকৃতিস্থ এমন কোনও লোক দেখা যায় না, যে লোক দুঃখের বিভীষিকায় কাতর হইয়া তৎপ্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছে না। জগতে যদি কিছু পরিহার্য্য বা বিদ্বেষের বিষয় থাকে, তবে তাহা দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর যদি কিছু প্রার্থনীয় বা ভালবাসার বস্তু থাকে, তাহাও দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাই মনুষ্যের—শুধু মনুষ্যের নহে—জীবসাধারণের ঐকান্তিক লক্ষ্য বা প্রার্থনীয় বিষয়। দুঃখ অপ্রিয় বলিয়াই দুঃখোৎপাদক বিষয়-সমূহও অপ্রিয় মধ্যে, এবং দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ আমাদের প্রিয় বলিয়া তৎসাধন-সমূহও সমানভাবে প্রিয়শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে, আনন্দলাভে অভিলাষবিহীন লোক জগতে দুর্লভ না হইতেও পারে; কিন্তু দুঃখশান্তি চাহে না, এরূপ লোক জগতে বস্তুতই দুর্লভ—নাই বলিলেও অত্যুক্তি বা অসঙ্গতি হয় না।

এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ অনিশ্চিত-স্বভাব ঐহিক সমুন্নতিকে লক্ষ্য না করিয়া, যাহা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ উত্তমাধম নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রার্থনীয়, যাহার উপায়ান্বেষণে জীবমাত্রেই ব্যাকুল, সেই দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত দর্শন-শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

* * *

হিন্দু-দর্শনের শ্রেণীবিভাগ।

হিন্দুদর্শনের সমষ্টি সংখ্যা ছয় হইলেও, বস্তুতঃ ঐ ছয়খানি দর্শন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন—ন্যায়দর্শন দুই—এক গোতমকৃত, অপর কণাদকৃত। সাংখ্যদর্শন দুই—এক কপিল-কৃত, দ্বিতীয় পতঞ্জলিকৃত। মীমাংসা দর্শন দুই—এক জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা, দ্বিতীয় বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা।

* * *

ষড়্দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য-চিন্তা।

অতঃপর উক্ত ছয়খানি দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনার অবসর উপস্থিত। ষড়্দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করা খুব আবশ্যক হইলেও, উহা এতই নিবিড় তমসাবৃত যে, আমাদের ক্ষীণতর জ্ঞানালোক সে অন্ধকার নিরসনপূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে নিতান্তই অপটু বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য যে, ইতিহাস-রসিক পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই এ কথায় সন্তোষ লাভ করিবেন না। বর্ত্তমান গবেষণার যুগে, সম্ভব হউক আর অসম্ভবই হউক, ঐ রকম একটা আলোচনা না থাকিলে প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা-দোষ দূর হয় না। এইজন্য প্রবন্ধের পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য অন্ততঃ 'বোধ হয় নিশ্চয়ই' অথবা 'সম্ভবতঃ খুব সত্য' ইত্যাদি অর্থহীন কতিপয় শব্দবিন্যাস দ্বারাও প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা দূর করিতে হয়। এই জন্য আমাকেও বাধ্য হইয়া উক্ত অনধিকারচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে।

দর্শনশাস্ত্রসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য-নিরূপণের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই যে, প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই অপর দর্শনের প্রতি কটাক্ষপাত ও

তন্মতখণ্ডনের সমধিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়দর্শন বৈশেষিকের মতে কটাক্ষ করিয়াছেন, বৈশেষিকও ন্যায়মতখণ্ডনে যত্ন করিয়াছেন। এইরূপ সাংখ্যদর্শন বৈশেষিক প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং মীমাংসার মতখণ্ডনে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারাও আবার অনুরূপ ব্যবহারে অপর সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। অধিক কি, পরমতখণ্ডন বা তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করা যেন দর্শনশাস্ত্রগুলির একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই দর্শনশাস্ত্রসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

দুষ্কর হইলেও উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করা একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। কারণ, দর্শনশাস্ত্রগুলি বিভিন্ন ঋষির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে রচিত হইলেও, ঐ সকল দার্শনিক মতবাদ ঋষিগণের আবিষ্কারের ফল নহে। ঐ সমুদয় মতবাদ বহু পুরাতন—স্মরণাতীত কাল হইতেই সুধীসমাজে সমাদৃত বা উপেক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল; এবং সেই সমুদয় মতবাদের অনুকূল (সমর্থক) ও প্রতিকূল বিভিন্ন সম্প্রদায় চিরকালই বিদ্যমান ছিল। এ কথার অনুকূলে ছান্দোগ্যোপনিষদের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করিতে পারা যায়।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে, যেখানে উদ্দালক ঋষি নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, সেখানে তিনি জগতের কারণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান জগৎ কারণ-স্বরূপ সৎ-ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। ইহার পরেই আবার পরমত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"তদ্ধৈক আহুঃ—অসদেবেদমগ্র আসীৎ।" হে

সোম্য, এক শ্রেণীর লোকেরা বলেন—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল। অৎস্তু, উদ্দালক ঋষি এই অসৎকারণবাদী নাস্তিকমত খণ্ডন করিয়া প্রথমোক্ত সৎকারণবাদই সমর্থন করিয়াছেন।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সকল দার্শনিক মত বা তত্ত্ব চিরকালই এদেশে বিভিন্নাকারে প্রচলিত ছিল। পরে মহাশয় ঋষিগণ সমাজের কল্যাণার্থ সেই সমুদয় পুরাতন চিন্তারাশিকেই দেশকাল পাত্রানুসারে সঙ্কলন পূর্ব্বক উপযুক্ত যুক্তিতর্ক সহযোগে বিবৃত করিয়াছেন মাত্র।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলে, ষড়্দর্শন সঙ্কলনের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণেরও একটা সুযোগ ঘটিতে পারে।

* * *

গোতম।

দেশে যে সময় বেদবিধি বিধ্বস্ত করিয়া ও চিরাচরিত সদাচার-পরম্পরা পদদলিত করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি দ্রুতবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এবং ভারতীয় নরনারীর হৃদয় হইতে পরলোকচিন্তা একেবারে অপসারিত করিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার ফলে অধিকাংশ লোকই যখন ইহকালসর্ব্বস্ব হইয়া—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ॥"

ইত্যাদি নাস্তিকবাদে সমধিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছিল ; সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনাদি বেদবোধিত সদনুষ্ঠান-সমূহ দেশ হইতে মহাপ্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই স্মরণীয় ভয়াবহ

সময়ে মহর্ষি গোতমের করুণহৃদয় দুঃস্থ সমাজের কল্যাণ-সাধনে সমুদ্যত হইল; মহর্ষি গোতম দেহাত্মবুদ্ধি-নিরাসে সচেষ্ট হইলেন।

বিচক্ষণ চিকিৎসক যেমন রোগ ও রোগীর অবস্থানুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, মহর্ষি গোতমও সমাজের তৎকালীন অবস্থানুসারে দুরধিগম্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি সূক্ষ্ম-তত্ত্বের উপদেশ অনুপযোগী ও অনর্থক বিবেচনা করিয়া সে পথ পরিত্যাগ করিলেন, এবং তদানীন্তন সমাজের যথার্থকল্যাণকরবোধে কেবল দেহাত্মবাদ-নিরাসে ও তদনুকূল যুক্তিতর্ক-সঙ্কলনে আপনার শক্তি নিয়োজিত করিলেন।

তিনি পরিমার্জ্জিত যুক্তিতর্কের সাহায্যে লোকদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, দেহ মন প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই জড়পদার্থ এবং অচেতন ও অনিত্য। অচেতন জড়পদার্থ কখনই চেতন আত্মার স্থান অধিকার করিতে পারে না; এবং আত্মা অনিত্য হইলে দৃশ্যমান বিশ্ববৈচিত্র্যও উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব দেহ, মন, প্রাণ প্রভৃতি কেহই আত্ম-শব্দ-বাচ্য নহে। প্রকৃত আত্মা হইতেছে—দেহাদির অতীত, নিত্য ও চেতন। দেহেতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমই জীবগণের সর্ব্বানর্থের নিদান; এবং তাহার নিবৃত্তিই পরমশান্তিময় মুক্তিলাভের নিদান। অতএব এই অনর্থ নিবৃত্তির জন্য এবং প্রকৃত আত্মার স্বরূপাধিগমের নিমিত্ত সকলেরই তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। মহর্ষি এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তদুপযোগী প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থ নিরূপণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন। তাঁহার পর মহামুনি কণাদের কথা।

* * *

কণাদ।

মহামুনি কণাদ দেখিলেন, গোতমের যুক্তিযুক্ত উপদেশে লোকের মতিগতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিয়ৎপরিমাণেও বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও নাস্তিক সম্প্রদায়ের পরমপ্রিয় স্বভাবকারণতাবাদ প্রভৃতি কতিপয় অনর্থবীজ অক্ষতদেহেই সমাজমধ্যে বিরাজমান আছে। এখন সে সমুদয়ের সমুচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক। তাই তিনি গোতমের অনুক্তাংশ-পরিপূরণ মানসে পরমাণু-কারণবাদ সংস্থাপনে এবং তদুপযোগী অন্যান্য বিষয় নিরূপণে সচেষ্ট হইলেন।

তিনি স্বকৃত বৈশেষিক-দর্শনে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, স্বভাব কখনই এই বিচিত্র বিশ্ব-নির্ম্মাণের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, স্বভাব নিজে অচেতন—হিতাহিত-বোধশক্তি-বিহীন; সুতরাং সে কখনই ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না, এবং তদনুসারে উত্তমাধম কার্য্যভেদেরও ব্যবস্থা করিতে পারে না। তাহার পক্ষে দেশকালনির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা একপ্রকার কার্য্য সম্পাদনই সম্ভবপর হয়, বৈচিত্র্য-সম্পাদন করা কখনই সম্ভব হয় না ও হইতে পারে না। অথচ দৃশ্যমান বিশ্বের বৈচিত্র্যরাশি আপামর সাধারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এক কথায়, উহা উড়াইয়া দিবার বা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিশেষতঃ স্বভাবের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলেও এ মতের অসারতা সহজেই ধরিতে পারা যায়। সৃষ্টি করা অর্থাৎ পরমাণু-পুঞ্জকে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত করাই যদি স্বভাবের স্বভাব হয়, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও পরমাণু-পুঞ্জের বিয়োগ ঘটিতে পারে

না; এবং সেই বিয়োগের ফলে প্রলয়ও সম্ভাবিত হইতে পারে না পক্ষান্তরে পরমাণু-পুঞ্জকে বিয়োজিত করাই যদি উক্ত স্বভাবের স্বভাব হয়, তাহা হইলেও চিরকাল প্রলয়াবস্থাই বিরাজ করিতে পারে, কখনও উহাদের সংযোগ-ফল সৃষ্টির সম্ভাবনা হইতে পারে না। এই সকল অনুপপত্তির ভয়ে যদি সংযোজন বিয়োজন উভয়ই স্বভাবের স্বভাব ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক হয় না। কারণ, তাদৃশ বিরুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন কোনও বস্তু কখনও কোথাও দৃষ্ট হয় না, এবং যুক্তির দ্বারাও সমর্থিত হয় না। অধিকন্তু, ঐরূপ বিরুদ্ধ-স্বভাব 'স্বভাব' পদার্থ-দ্বারা সৃষ্টি-কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে না। কারণ, যে মুহূর্ত্তে সংযোজন-স্বভাব দুইটী পরমাণুকে সম্মিলিত করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বিয়োজন-স্বভাব আবার ঐ দুইটী পরমাণুরই বিশ্লেষণ ঘটাইবে; কারণ সন্নিহিত থাকিলে কার্য্য না হইবার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কোনও কারণ দেখা যায় না। এ সকল আপত্তি খণ্ডনের জন্য যদি স্বভাবেরও কার্য্য নিয়ামক অপর কোনও শক্তি-বিশেষাদি কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও সৃষ্টিকার্য্যে স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায় না। অতএব উক্ত প্রকার স্বভাব কখনই জগৎ-সৃষ্টির নির্ব্যূঢ় ভার গ্রহণ করিতে পারে না; এই কারণে, নিত্য নিরবয়ব পরমাণু-রাশিকেই জগতের আদি উপাদান-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এবং জীবগণের পূর্ব্বসঞ্চিত অদৃষ্ট-সহচর পরমেশ্বরকে সৃষ্টি কার্য্যে নিমিত্ত-কারণরূপে গ্রহণ করিতে হয়। জীবগণের প্রাক্তন অদৃষ্টানুসারে জগতে সৃষ্টিবৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেক পরমাণুতে 'বিশেষ' নামক এক প্রকার পদার্থ আছে (যাহার দ্বারা পরমাণু-সমূহের বৈলক্ষণ্য রক্ষিত হয়), সেই 'বিশেষ' পদার্থের দ্বারা

সৃজ্যমান বস্তুরাশির বৈচিত্র্য সাধিত হয়, এ কথা অনিচ্ছাপূর্ব্বকও স্বীকার করিতে হইবে।

এতদতিরিক্ত যে সমুদয় বিষয় গোতম ঋষি স্বকৃত ন্যায়দর্শনে উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন,—যেমন দেহাতিরিক্ত নিত্য চেতন আত্মার অস্তিত্ব, সেই আত্মার সুখদুঃখাদিভোগ ও বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থা প্রভৃতি,—সেই সমুদয় বিষয়ে সম্মতি-প্রদান পূর্ব্বক মহামুনি কণাদ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

* * *

কপিল।

কণাদের পরই কপিলের কথা বলিতে হয়। মহামুনি কণাদ আপনার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া বিরত হইলে পর, মহামুনি কপিল অবসর বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি দেখিলেন, মহর্ষি গোতম ও কণাদের প্রচেষ্টায় যে দুইখানি দর্শনশাস্ত্র (ন্যায় ও বৈশেষিক) প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে; ঐ উভয় দর্শনই লোকসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। উঁহাদের অপরিসীম প্রভাবে লোকের হৃদয় হইতে দেহাত্মবাদ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইয়াছে; নাস্তিকতাও অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং লোকের মন অধ্যাত্মচিন্তার পথেও শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। সেই শুভ সময় ও সুযোগ বুঝিয়া কপিলদেব আরও কিঞ্চিৎদূর অগ্রসর হইলেন,—অধ্যাত্ম-চিন্তার উপযোগী দিগ্‌দর্শনে মনোযোগী হইলেন। কপিলদেব আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাঙ্খ্যদর্শন প্রণয়ন করিলেন; এবং তাহাতে বিবেকজ্ঞানোপযোগী প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব সন্নিবেশিত করিলেন।

তিনি স্বকৃত সাঙ্খ্যদর্শনে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত নিত্য, চৈতন্য এবং কর্ত্তা ভোক্তা ও দেহ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন,—শুধু ইহা জানিলেই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জানা হয় না; কারণ, আত্মা যেমন দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, তেমনই সুখদুঃখাদিরও অতীত; কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বুদ্ধি-ধর্ম্মগুলি অবিবেকবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। চৈতন্য আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম নহে, পরন্তু আত্মার স্বরূপ। আত্মা অসঙ্গ ও উদাসীন

* কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ও সুখদুঃখাদি ধর্ম্মগুলি প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বুদ্ধি প্রভৃতির ধর্ম্ম, কেবল অবিবেকের ফলে পুরুষগত বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় মাত্র। যত দিন বিবেক-জ্ঞান উদিত হইয়া সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অবিবেকের সমূলে উন্মূলন করিতে না পারিবে, ততদিন ঐরূপ ভ্রান্তি-সহচর সুখদুঃখাদি ধর্ম্মগুলি আত্মগত বলিয়া অবশ্যই প্রতীত হইবে। এই অবিবেক নিবৃত্তির জন্য বিবেকজ্ঞান—প্রকৃতি হইতে পুরুষের (আত্মার) পার্থক্যবোধ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

* * *

প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে তিনটী গুণ বা মৌলিক পদার্থ আছে। উক্ত প্রত্যেক গুণই নিত্য ও অনন্ত। উহাদের সমষ্টির নাম প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ, কিন্তু উহা ন্যায় ও বৈশেষিকোক্ত পরমাণু নহে। সাঙ্খ্যমতে পরমাণু অনিত্য, সাবয়ব ও পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং উহাও উৎপত্তি-শীল,—নিত্য নহে। জাগতিক পরমাণু-সমূহ সাঙ্খ্যোক্ত 'তন্মাত্র'-স্থানবর্ত্তী, কাজেই অনিত্য সাবয়ব পরমাণু কখনই নিখিল জগতের

আদি উপাদান হইতে পারে না; এই জন্য নিত্য প্রকৃতিকেই নিখিল জগতের মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রকৃতি নিত্যা হইয়াও পরিণামশীলা; সুতরাং তদারব্ধ দৃশ্যমান জগৎও পরিণামশীল। কিন্তু প্রকৃতির ন্যায় জগতের—অধিক কি ধূলিকণারও—অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয় না; রূপান্তর হয় মাত্র

প্রকৃতি অচেতন—বিচারশক্তিবিহীন হইলেও, চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ তাহাতে কার্য্যশক্তি সঙ্ক্রামিত হয়। ইহাকে 'অন্ধ-পঙ্গু' ন্যায় বলে। অন্ধ দৃষ্টিশক্তিবিহীন—পথ দেখিতে পায় না, আবার পঙ্গু ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও ক্রিয়াশক্তি না থাকায় পথ চলিতে পারে না; কিন্তু তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যদি পরস্পরকে সাহায্য করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পথ চলিতে সমর্থ হইতে পারে,—পঙ্গু পথ দেখাইতে লাগিল, আর অন্ধ তদনুসারে পথ চলিতে লাগিল। এইভাবে উহাদের উভয়ের সহযোগিতায় অভীষ্টস্থানে গমন যেমন সম্ভবপর হয়, তেমনি অচেতন প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ, এতদুভয়ের সহযোগে কোনও কার্য্যই অসম্ভব বা অসাধ্য হয় না।

এইরূপ ব্যবস্থানুসারে সাঙ্খ্যকার কপিলদেব নাস্তিক্যবাদবিমুগ্ধ তদানীন্তন লোকদিগের কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টির জন্যই যেন জগৎকারণ পরমেশ্বরকে পর্য্যন্ত বাদ দিতে বাধ্য হইলেন। কেবল বিবেক জ্ঞানের একান্ত উপযোগী দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব, নিত্যত্ব, বিভুত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব এবং জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি দৃঢ়তর প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক সাহায্যে অতি উত্তমরূপে সংস্থাপন করিয়া, তিনি আপনার কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন।

* * *

পতঞ্জলি।

এইবার মহামুনি পতঞ্জলির কথা বলিব। যে সময় কপিলদেবের সিদ্ধান্তবাদ ভারতীয় সভ্যসমাজে সমাদরে গৃহীত হইয়াছে; অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই সে মতে সম্মতিপ্রদানপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট পথে ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছে; কেহই আর দেহাত্মবাদের কুহকে আত্মসমর্পণ করিতেছে না; সেই শুভমুহূর্ত্তে মহামুনি পতঞ্জলির সদয় হৃদয় সমাজের কল্যাণ-চিন্তায় নিযুক্ত হইল।

পতঞ্জলি মনে করিলেন,—কপিলদেব অনুপযোগী-বোধে তৎকালে যে সমস্ত বিষয় বলেন নাই, অথবা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, এখন সেই সমুদয় অনুক্ত অংশের উপদেশ ও সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তৃতি-বিধানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তার পর তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই প্রথমে আত্মজ্ঞানের উপযোগী যোগ, যোগবিভাগ ও তৎসাধনার প্রণালীসমূহ উত্তমরূপে উপদেশ করিলেন; এবং যোগসিদ্ধির অন্যতম উপায়রূপে পরমেশ্বরের অবতারণা করিয়া, সাংখ্যশাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার সমাধান করিলেন। তথনও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের উপযুক্ত সময় হয় নাই বিবেচনা করিয়া, কথিত ঈশ্বরকে কেবল ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত পুরুষ-বিশেষমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এবং বিস্তৃতভাবে যোগ, যোগ-সাধনা ও যোগফল প্রভৃতি মনোপযোগী বিষয়-সমূহ নিরূপণ করিয়াই যোগদর্শন পরিসমাপ্ত করিলেন।

* *

জৈমিনি।

এইরূপে ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনের প্রচার-বাহুল্যের ফলে দেশে যখন নাস্তিকতার খরতর স্রোত ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হইল, শনৈঃশনৈঃ জন্মান্তর চিন্তা আসিয়া লোকের হৃদয়দেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল, এবং ঐহিক ভোগসুখের তীব্র বাসনা নিতান্ত ক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইল; তখন মহর্ষি জৈমিনি 'পূর্ব্ব-মীমাংসা' প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

মীমাংসা মাত্রই সংশয়-সাপেক্ষ। যেখানে সংশয়, সেখানেই মীমাংসার প্রয়োজন। সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি না থাকিলে মীমাংসার কথা উঠিতেই পারে না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখনও দেশের লোক বেদবাক্যের নির্ব্যূঢ় প্রামাণ্য-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অদ্বৈত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের গূঢ় রহস্যও হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা লাভ করে নাই। বিশেষতঃ, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত সে ক্ষমতা লাভ করাও সম্ভবপর হয় না; অথচ ভোগলালসাপরবশ লোক-সকল সহজে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইতে চাহে না; এই সব কারণে তিনি প্রথমতঃ বেদবাক্যের উপর জনসাধারণের অনুরাগ-বর্দ্ধনের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর জোর দিয়া বলিলেন,—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্॥"

অর্থাৎ,—যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদনই বেদের প্রধান উদ্দেশ্য যে সমস্ত বেদবাক্যে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ নাই—কেবলই প্রসিদ্ধ বস্তুর উল্লেখমাত্র আছে, সে সমস্ত বেদবাক্য নিরর্থক; নিরর্থক

থাকিয়াই অপ্রমাণ। অতএব সে সমুদয় বাক্যের আলোচনায় কোনও প্রয়োজন নাই। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিত্যাগ,—ইহাই দুঃখভীত লোকদিগের সর্ব্ববিধ দুঃখ-প্রশমনের একমাত্র উপায়। অতএব যথানিয়মে সকলকেই বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, কামনার পরবশ লোকেরা প্রথমতঃ ফলের লোভে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে; এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে আশানুরূপ ভোগ্য ফল লাভ করিয়া বেদবাক্যের সত্যতায় সন্দেহশূন্য হইবে। ক্রমে বেদোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেও অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। অনন্তর তাহাদের নির্ম্মলচিত্তে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কৌতূহল আপনা হইতেই জাগরিত হইবে। তখন দুরূহ ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষেও সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইবে।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই জৈমিনি মুনি লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিলেন যে,—বেদশাস্ত্র নিত্য, অপৌরুষেয় এবং স্বতঃপ্রমাণ। বেদোক্ত কর্ম্ম-কলাপই জীবগণের ইহপরকালের সহায় ও সুহৃদ্ এবং সাংসারিক সর্ব্ববিধ দুঃখ-প্রতিকারের অমোঘ উপায়। স্বর্গই পরমানন্দধাম। সে স্বর্গধাম একমাত্র কর্ম্মলভ্য আত্মা নিত্য ও স্বকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তা; এবং ভোগ্য জগৎ মিথ্যা মায়া-কল্পিত নহে; ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপদেশ করিয়া এবং জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া, সুদৃঢ় বেদভিত্তির উপর সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বৃহৎ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা পরিসমাপ্ত করিলেন।

* * *

বেদব্যাস ও বেদান্তদর্শন।

পরমমঙ্গলময় গোতমাদি ঋষিবৃন্দের অলৌকিক প্রতিভা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে সময় দেহাত্মবুদ্ধির ব্যামোহ দেশ হইতে বিদূরিত হইয়াছে; প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান বিষয়ে লোকের সমধিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সুব্যবস্থিত হইয়াছে; চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রকৃষ্ট পথ যোগসাধনেও লোকের আগ্রহ জন্মিয়াছে; এবং চিত্তের বিশুদ্ধি-সাধনের ও বিক্ষেপ- (চাঞ্চল্য-) নিবারণের প্রশস্ত পথ কর্ম্মকাণ্ডের উৎকৃষ্ট পদ্ধতিও লোকসমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে; কেবল, জীব-নিস্তারের প্রধান সহায়, শান্তিময় মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট সাধন এবং বেদের সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা তখনও একপ্রকার অজ্ঞানের অন্ধকূপে লুক্কায়িত রহিয়াছে; সেই শুভ সময়ে ভগবান নারায়ণাবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি অবতীর্ণ হইয়া, ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত দেখিয়া, তদ্বিষয়ক উপদেশ-দানে মনোযোগী হইলেন। লোকের বোধসৌকর্য্যসাধনমানসে প্রথমে তিনি বেদবিভাগ-পূর্ব্বক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটী সংহিতা প্রচার করিলেন। অনন্তর বেদসার ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের প্রকৃতার্থ-নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে পরম উপাদেয় উত্তর-মীমাংসা-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি উত্তর-মীমাংসায় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, বেদের প্রকৃত উপদেশ হইতেছে এই যে,—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সদ্বস্তু ছিল; তিনি এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাঁহার সজাতীয় বা বিজাতীয় অপর কোন বস্তুই ছিল না,

এবং বর্ত্তমানেও নাই, এবং তাঁহার স্বগতভেদ বা অংশও নাই—তিনি নিরবয়ব।

"তদৈক্ষত বহু স্যাং—প্রজায়েয়।"

তিনি স্থির করিলেন, 'আমি বহু হইব—জন্মিব।' তিনি সত্য-সঙ্কল্প, তাঁহার ইচ্ছা-মাত্রে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইল।

এ সমস্তই সূক্ষ্ম পদার্থ,—ভোগের অযোগ্য। তাই তাঁহার পুনরায় সঙ্কল্প হইল—

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি—তাসামেকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি।"

অর্থাৎ,—এই যে ভূতবর্গ (ছান্দোগ্যে—তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই তিন, কিন্তু তৈত্তিরীয় মতে—আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চ) সৃষ্ট হইল, আমিই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া এ সকলকে 'ত্রিবৃৎ' (ত্র্যাত্মক,—পঞ্চীকৃত) করিব; অর্থাৎ পরস্পরের সংমিশ্রণে পঞ্চভূতকে জীবভোগ্য স্থূলাকারে পরিণত করিব, এবং ইহাদের ব্যবহারোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিব।

এইরূপে স্বয়ং ব্রহ্মই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে ভোগযোগ্য স্থূলাকারে পরিণত করিয়া নিজেই নিজকল্পিত জগৎ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এই সকল উক্তি হইতে বেদব্যাস বুঝাইয়া দিলেন—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু; তাঁহার সজাতীয়, বিজাতীয় কিংবা স্বগত কোনও ভেদ নাই। তিনি অখণ্ড ও অনন্ত। এই জগৎ তাঁহারই সঙ্কল্প-প্রসূত। মানব স্বপ্ন সময়ে যেরূপ নিজের কল্পনাপ্রসূত স্বাপ্ন-দুঃখ দেখিয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করে; আবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া

গেলে ঐ সমস্ত বস্তু অদৃশ্য হইয়া যায় এবং মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, ঠিক সেইরূপ পরিদৃশ্যমান জগৎও কল্পনাময়; জীবগণ যতক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে, ততক্ষণ এই দৃশ্য-প্রপঞ্চের বিরাম হইবে না,—অক্ষয় অজয় বলিয়া প্রতীত হইবে। যদি কখনও সৌভাগ্য-বশে জীবের মায়া-নিদ্রা অন্তর্হিত হইয়া যায়; জীব যদি নিজে নিজের ব্রহ্মভাব—নিত্য-মুক্ত-স্বভাব বুঝিতে পারে, তবে তখন সে বুঝিতে পারিবে যে, এই জগৎ মায়াময় স্বপ্নদৃশ্যতুল্য অসত্য; ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য; এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিও সেই ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং নিত্যানন্দময় আমাতে আগমাপায়শীল-সুখদুঃখ-সম্ভাবনা কেবল ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। তখন তাহার সমস্ত দ্বৈত-বিভ্রম বিদূরিত হইবে, এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই শ্রুতিবচনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া চিরশান্তিলাভে কৃতার্থ হইবে।

বেদব্যাস এই পরমরমণীয় ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহার বিবৃতি ও তদধি-গমের বিবিধ উপায়—শমদমাদি সাধনসম্পত্তি, এবং তদনুকূল অন্যান্য বহু বিষয় উত্তমরূপে বিবৃত করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য—ব্রহ্মবিদ্যা সুধীসমাজে প্রচার করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিলেন॥

* * *

বেদান্ত।

আমরা বেদবিদ্যার কথা বলিতে যাইয়া আবশ্যক-বোধে অনেক-গুলি প্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি প্রাসঙ্গিক হইলেও সে সকল কথা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সুধীবর্গের নিতান্ত বিরক্তি-

ঙ্কর হইবে না। যাহা হউক, এখন প্রাসঙ্গিক কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কথার অবতারণা করিতেছি।

বেদান্তশাস্ত্র—বেদের সারভাগ। যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্ম-বিদ্যা সমস্ত বেদশাস্ত্রের মধ্যে ফল্গুনদীর পয়ঃপ্রবাহের ন্যায় স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে, অথবা দুগ্ধমধ্যগত নবনীতের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে, আলোচ্য 'বেদান্ত' তাহারই প্রকট মূর্ত্তি বা অবস্থাবিশেষ মাত্র। উপনিষৎ শাস্ত্রেই সেই বেদসার ব্রহ্মবিদ্যা প্রধানতঃ স্থানলাভ করিয়া লোকবুদ্ধির গোচরে আসিয়াছে। এই জন্য উপনিষৎ-শাস্ত্রই 'বেদান্ত' শব্দের মুখ্যার্থ-রূপে পরিচিত হইয়াছে। তাহার পর, আরও যে সকল গ্রন্থ সেই বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মবিদ্যার সমর্থন-কল্পে নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও মীমাংসার অবতারণা করিয়াছে, সেই সকল গ্রন্থও 'বেদান্ত' নামে পরিচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বেদান্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও এই শ্রেণীর বেদান্তমধ্যে পরিগণিত। এই ভাবে গৌণ-মুখ্য ভেদে বেদান্ত-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যাত্মক বেদান্তশাস্ত্র অপরিমার্জ্জিত সাধারণ বুদ্ধির অগম্য-অতিশয় দুরূহ শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাহারা উপযুক্ত সাধন-সম্পত্তি-বিহীন নিতান্ত অশান্তহৃদয় লোক, ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা বেদান্তের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত দুরূহ ও দুরধিগম্য বেদান্তবিদ্যাও ভারতে সুধীসমাজে অপরিচিত বা অনালোচিত ছিল না, বরং পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, এ দেশে এমন এক পবিত্র সময় আসিয়াছিল, যে সময় দুরূহ বেদান্তবিদ্যা বিদ্বৎ-সমাজে জীবনের সারতর লক্ষ্যরূপে

পরিগণিত হইয়াছিল, এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার-বাহুল্যের জন্যও সমধিক আয়োজন হইয়াছিল। বেদান্তবিদ্যা যে এ দেশে কি পরিমাণে লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, একটী মাত্র প্রাচীন প্রবচন পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার কতকটা আভাস বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন মনীষিগণ আপনাদের অতিপ্রিয় বেদান্তবিদ্যার গুণগান করিতে যাইয়া তারস্বরে বলিয়াছিলেন—

"আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া।"

অর্থাৎ, তমোময়ী নিদ্রা-সমাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর সর্ব্বংকশ মৃত্যুর করাল কবলে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বেদান্তচিন্তার সময় অতিবাহিত করিবে। অর্থাৎ, আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যাবৎ বাঁচিয়া থাকিবে এবং যাবৎ নিদ্রাপরবশ না হইয়া জাগরিত থাকিবে, তাবৎকাল পরমমঙ্গলময় বেদান্তবিদ্যার অনুশীলন করিতে থাকিবে, বেদান্তচর্চ্চাকেই জীবনের সারতর অবলম্বন করিবে।

এই উপদেশবাণী এ দেশের আদর্শভূত জ্ঞানবিজ্ঞাননিরত ও সত্য-সন্তোষাদি সৎসাধনের নিত্য সহচর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের পূত কণ্ঠ হইতে শোকসন্তাপতপ্ত বিশ্বমানবের হিতার্থে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, এবং ইহার দ্বারা দেশে দেশে বেদান্ত-বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকমালা বিসর্পিত হইয়াছিল। উল্লিখিত একটীমাত্র উপদেশবাণী হইতেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালে এদেশে বেদান্ত-বিদ্যার প্রভাব, প্রতিষ্ঠা ও সমাদর কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

যাঁহারা বেদান্তের অপূর্ব্ব মহিমান্বিত রহস্যরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে বিশেষভাবে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদান্তের গুণকীর্ত্তন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়

না হইতে পারে ; কিন্তু যাহারা আংশিক-ভাবেও বেদান্তের মর্ম্মগ্রহণ করিবার উপযুক্ত অবসর লাভ করে নাই, এবং সাধারণভাবেও উহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারাও যে বেদান্তের অপূর্ব্ব রহস্য-কথা শ্রবণ করিয়া সমধিক আদর, আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। মনে হয়, বেদান্ত-শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতশূন্য অসীম উদারতাই তাদৃশ লোকানুরাগবৃদ্ধির নিদান। ভারতে এমন কোনও শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা ধর্ম্মসম্প্রদায় দৃষ্ট হয় না, যাহার উপর বেদান্তের প্রভাব অল্পমাত্রও বিসর্পিত হয় নাই। এই কারণেই অতীতকালে বেদান্তের অনন্যসাধারণ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার সদ্ভাব অনুমিত হয়।

বেদান্ত-শাস্ত্রের অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার অপর কারণ এই যে, মূল বেদান্ত শাস্ত্র প্রকৃত-পক্ষে কোনও ব্যক্তি-বিশেষের কপোল-কল্পিত বা উদ্দাম কল্পনা-প্রসূত মতবাদ মাত্র নহে ; উহা বস্তুতঃ স্বতঃপ্রমাণ অপৌরুষেয় বেদ-শাস্ত্রেরই সারভূত (রহস্যাত্মক) অংশবিশেষ। বেদ-শাস্ত্র কখনই কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে ; উহা সকলেরই অধিকারভুক্ত ; উপযুক্ত অধিকার অর্জ্জন করিতে পারিলে সকলেই সমানভবে উহার রসাস্বাদে সমর্থ হইতে পারে। আলোচ্য বেদান্ত-শাস্ত্র সেই বেদেরই সারভূত অংশ-বিশেষ বলিয়া উহাতে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতার সম্বন্ধ বা পক্ষপাত থাকা সম্ভবপর হয় না।

মূল বেদান্ত যে, বেদেরই অংশবিশেষ, তাহা বেদ-ভাষ্যকার আপস্তম্বের উক্তি হইতেও জানিতে পারা যায়। বেদের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনাম-

ধেয়ম্,” অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক সংহিতাভাগ আর মন্ত্রার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণভাগ, এতদুভয়ের নাম ‘বেদ’। এতদনুসারে বুঝা যায়, বেদ-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম—মন্ত্র বা সংহিতা, অপর ভাগের নাম—ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ প্রধানতঃ কর্ম্ম ও তদুপযোগী মন্ত্র প্রধান, আর ব্রাহ্মণভাগ প্রধানতঃ মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা-স্বরূপ, এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের প্রকাশক। আরণ্যক ও উপনিষদ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অংশগুলি এই ব্রাহ্মণ-ভাগেরই অন্তর্গত।

বিশেষ এই যে, বেদের যে সকল অংশ প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক, জীব জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি রহস্যবিদ্যা প্রকাশনে ব্যাপৃত, বেদের সেই সমুদয় অংশই ‘উপনিষদ্’ নামে অভিহিত ও পরিচিত হইয়াছে। ‘উপনিষৎ’ শব্দের যৌগিক অর্থানুসারেই ঐরূপ বিশেষ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। * এই জন্যই দেখা

* আচার্য্যগণ ‘উপনিষদ্’ শব্দের এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—‘উপ’ অর্থ শীঘ্র ও সামীপ্য; ‘নি’ অর্থ—নিশ্চয় ও নিঃশেষ; ‘ষদ্’ অর্থ—বিশরণ, অবসাদন ও গমন। এই কয়টী (উপ+নি+ষদের) সমুদিত অর্থ হইতেছে—যে বিদ্যা শীঘ্র নিশ্চিতরূপে সংসারের সত্যতা বুদ্ধি শিথিল করিয়া দেয়, অথবা সংসারের নিদান অবিদ্যা ও তৎকার্য্য—সংসার-বন্ধনের অবসন্নতা ঘটায়, অথবা যে বিদ্যা অধিগত হইয়া জ্ঞাতাকে ব্রহ্ম সমীপে লইয়া যায়, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার নাম—উপনিষদ্। তাদৃশ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে সমস্ত গ্রন্থে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা স্থান পাইয়াছে, সে সমুদায় গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রায়, মন্ত্র-ভাগের মধ্যেই হউক, আর ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যেই হউক, যেখানেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা মুখ্যভাবে স্থান পাইয়াছে, তাহাই উপনিষদ্ নামে পরিগণিত ও পরিচিত হইয়াছে। অধিকাংশ উপনিষদ্ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত হইলেও মন্ত্রভাগে যে উহার অত্যন্ত অভাব আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, প্রসিদ্ধ ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মন্ত্রভাগেরই অন্তর্গত। তবে মন্ত্র-ভাগের মধ্যে উপনিষদের সংখ্যা যে খুবই কম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। * উক্ত উপনিষদ্ শাস্ত্র বেদের সারসর্ব্বস্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব) দোহন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এবং যথাসম্ভব বেদের আদি মধ্য ও অন্ত ভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই উপনিষদ-ভাগই যে যথার্থ বেদান্ত এবং বেদান্ত অর্থ যে বেদেরই সারভাগ, এ কথা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি। 'বেদান্ত' শব্দের এবম্বিধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সদানন্দ যতীন্দ্র বলিয়াছেন—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্; তদুপকারীণিচ শারীরকসূত্রাদীনি।" (বেদান্তসার)।

এখানে দেখা যায়, সদানন্দ যতীন্দ্র প্রধানতঃ বৈদিক উপনিষদ্-ভাগকেই মুখ্য বেদান্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং উপ-নিষদের উপকারী বা তাৎপর্য্যপ্রকাশক ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতিকেও বেদান্ত মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তদনুসারে

এই কারণে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অবৈদিক গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে পরিচিত হইয়াছে।

* প্রসিদ্ধ ঈশোপনিষদ্ যজুর্ব্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত। কৌষিতকী মন্ত্রোপনিষদ্ও বেদ-সংহিতারই অন্তর্গত। এই প্রকা আরও উপনিষদ্ আছে।

অধ্যাত্মবিদ্যা-প্রকাশক সনৎ-সুজাতীয় সংবাদ ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থও বেদান্ত-মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু 'ন্যায়রত্নাবলী' প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শারীরক মীমাংসার (বেদান্ত-দর্শনের) চারি অধ্যায়, এবং আচার্য্য-প্রণীত তদ্ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র কৃত তৎটীকা, কল্পতরু নামক তদীয় টীকা ও কল্পতরুটীকাপরিমল,—এই পাঁচখানা গ্রন্থই প্রধানতঃ বেদান্ত পদবাচ্য। *

এখানে বলা আবশ্যক যে, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর উল্লিখিত মতবাদ যুক্তিসঙ্গত বা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কারণ, উক্ত পাঁচ খানির অতিরিক্ত আরও বহু বহু গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে 'বেদান্ত' নামে প্রচলিত আছে; এবং বৈদান্তিক আচার্য্যগণও নির্ব্বাক্যব্যয়ে সে সকল গ্রন্থ আদর ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা ঐ সকল গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা টীকাও রচনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সে সকল গ্রন্থকে বেদান্তসংজ্ঞালাভে বঞ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। † কিন্তু তিনি যদি বেদান্ত শব্দে কেবল বেদান্তদর্শন মাত্র অর্থ করিয়া থাকেন, এবং তদনুসারে ঐরূপ উক্তি

* "বেদান্তশাস্ত্রোক্ত শারীরকমীমাংসা চতুরধ্যায়ী—তদ্ভাষ্য—তদীয় টীকা বাচস্পত্য—তদীয় টীকা কল্পতরু—তদীয় টীকা পরিমলগ্রন্থ পঞ্চকে তাৎপর্য্যং।" (ন্যায়রত্নাবলী)।

† শঙ্করাচার্য্যকৃত উপদেশসাহস্রী, বিবেকচূড়ামণি, আত্ম-বোধ ও সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার এবং সংক্ষেপশারীরক, অদ্বৈত-সিদ্ধি, চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বেদান্ত ভাণ্ডারে উজ্জ্বল রত্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি দোষাবহ মনে হয় না; কারণ বেদান্ত দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ঐ পাঁচ খানি গ্রন্থের গুরুত্ব ও প্রভাব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অবিসংবাদিত, সে কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

আলোচ্য বেদান্ত শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। উহার এক এক ভাগকে 'প্রস্থান' নামে অভিহিত করা হয়। প্রস্থান অর্থ—সাম্প্রদায়িক বিভাগ। বেদান্তের প্রথম প্রস্থান—উপনিষদ্; দ্বিতীয় প্রস্থান—ব্রহ্মসূত্র; তৃতীয় প্রস্থান—ভগবদ্গীতা প্রভৃতি। * উক্ত বিভাগ অনুসারে শ্রুতি, স্মৃতি ও তর্ক,—তিনই

* এই প্রকার প্রস্থান ভেদ নির্দ্দেশ দ্বারা বিদ্যার্থিগণের পাঠৌপযোগিতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথমে উপনিষদ্ প্রস্থান অধ্যয়ন করিবে, পরে বেদান্তদর্শন পড়িবে, অনন্তর ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত সংকলন করিবে। এই জন্য উপনিষদ্ শাস্ত্রকে বেদান্তের সূত্রস্থানীয়, ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাখ্যা বা ভাষ্য-স্থানীয়, আর ভগবদ্গীতা প্রভৃতিকে উপসংহারস্থানীয় বলা হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত উপনিষদ্ শাস্ত্র আলোড়ন-পূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের মধ্যে যে সারসিদ্ধান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, মহর্ষি বেদব্যাস ভগবদ্গীতার মধ্যে তাহাই স্বল্পকথায় ও সরল ভাষায় গুরুশিষ্য-সংবাদরূপে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রণালীও এই ক্রমেই সম্পন্ন হইত। প্রথমে উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠ করিত। পরে উপনিষদের মীমাংসা ও তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য বেদান্তদর্শন পাঠ করিত, এবং সর্ব্বশেষে বেদান্তের রহস্য বা সারসিদ্ধান্ত সঙ্কলনার্থ ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিত।

বেদান্তের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে উপনিষদ্‌ভাগ হইতেছে সাক্ষাৎ শ্রুতি; ভগবদ্গীতা প্রভৃতি—স্মৃতি; আর ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) হইতেছে—তর্ক-স্বরূপ। বেদান্তশাস্ত্র এইরূপে বিভিন্ন প্রস্থানে বিভক্ত হইলেও, সকলেরই লক্ষ্য বা অভিপ্রায় বিষয় এক—সেই ব্রহ্মবিদ্যা। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা ফলতঃ একই বিদ্যার নাম-ভেদ মাত্র।

জগতে যত প্রকার বিদ্যা বিদ্যমান বা প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এই ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যার সার—পরাবিদ্যা; * তদ্ভিন্ন যত বিদ্যা, সমস্তই অপরাবিদ্যারূপে পরিগণিত। পরাবিদ্যার বিষয় এক (ব্রহ্ম); সুতরাং বিদ্যাও এক প্রকার। কিন্তু অপরাবিদ্যা বিষয়-ভেদে বহু প্রকার প্রশ্নোপনিষদে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা চৈবাপরা চ" বলিয়া পরাপর-ভেদে দ্বিবিধ বিদ্যার উল্লেখ করিয়া প্রথমতঃ অপরাবিদ্যার পরিচয় প্রদানোপলক্ষে ঋগ্বেদ প্রভৃতি বহু প্রকার বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সে সকল বিদ্যার কেবল প্রচার-মাত্র রহিত হয় নাই, নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়াছে। সে সকল বিদ্যার পুনরায় আবির্ভাব হইবে কিনা, তাহা ভগবান্‌ই জানেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরাবিদ্যা একই প্রকার; উহার লক্ষ্য এক বলিয়াই আর বিভাগ বা প্রকারভেদ সম্ভবপর হয় না। পরাবিদ্যার স্বরূপ-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন—"অথ

* স্বয়ং ভগবান্‌ও সর্ব্ববিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" (ভগবদ্গীতা ১০।৩২)—আমিই সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-বিদ্যা-স্বরূপ।

পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। যাহা দ্বারা সেই অক্ষর-পদবাচ্য পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, তাহার নাম পরাবিদ্যা। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই সংসারানলতপ্ত জীবগণ পরম শান্তিলাভে সমর্থ হয়। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; এই জন্য পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। বেদান্ত শাস্ত্র সেই বিদ্যা প্রচার করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈদিক উপনিষদাবলীই বেদান্ত শব্দের মুখ্য অর্থ।

আর্য্য ঋষিগণ এই উপনিষদের সাহায্যেই সভ্য সমাজে পরম পবিত্র ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিতেন এবং শোকসন্তাপ-সমাকুল মানবগণের হৃদয়ে শান্তিসুধা-সিঞ্চনে সমর্থ হইতেন। কিন্তু যাহাদের হৃদয়-দর্পণ বহু-জন্মার্জ্জিত ভেদ-বাসনাবশে নিতান্ত মলিন, শত চেষ্টায়ও সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা-পথে আনয়ন করিতে পারে না, তাহারা কখনই ব্রহ্মবিদ্যালাভে কিংবা দুর্ব্বিজ্ঞেয় অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদে সমর্থ হয় না ও হইতে পারে না; বরং পদে পদে সংশয় ও বিপর্য্যয়ের দ্বারা প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। জিজ্ঞাসু জনের পক্ষে তাদৃশ সংশয় ও বিপরীত ভাবনা বিদূরিত করিতে হইলে, অধিগত বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রগাঢ় মনন বা শাস্ত্রসম্মত বিচার করা আবশ্যক হয়, উপনিষদের ঋষিগণ এ কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; সেই জন্য তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে মননের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মনন অর্থই বিচার। কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত বিচার-প্রণালী অভ্রান্ত হইলেও বড়ই সংক্ষিপ্ত; চঞ্চলচিত্ত লোকেরা তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রবোধ লাভ করিতে পারে না। এই অসুবিধা অপনয়নের নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস দয়াপরবশ হইয়া বিবিধ তর্কযুক্তি-সমন্বিত বেদান্ত-

মীমাংসা বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বিশাল উপনিষদ্-সাগর মথন-পূর্ব্বক বেদান্ত দর্শনরূপ মহারত্নের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, বেদান্তদর্শনের বিপুল কলেবর যে কেবল উপনিষদের বাক্যার্থ বিচারেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মবিদ্যার অনুকূল ও প্রতিকূল যত প্রকার বিষয় আছে, সে সমস্তই উহার উদরে উত্তমরূপে স্থান লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা যে উহার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

* * *

বেদান্ত-দর্শন।

বেদান্তদর্শন বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও গৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ও প্রশংসনীয়। এ গৌরবের বিশেষ কারণ এই যে, ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি প্রায় সমস্ত দর্শনেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রৌঢ়বাদ ও অভ্যুপগমবাদ স্থান পাইয়াছে; * কিন্তু বেদান্তদর্শনে সে সকল দোষের

---

* প্রাচীন আর্য-শাস্ত্রের মধ্যেও যে 'অভ্যুপগমবাদ' প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে, তাহা আমরা বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠে জানিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে,—

"এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্য, বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম॥"

হে দৈত্য, ভেদদর্শী লোকদিগের জন্য আমি অভ্যুপগমবাদ স্বীকার পূর্ব্বক এই সকল বিকল্প (মতভেদ) নির্দ্দেশ করিলাম। এখন আমার নিকট এ সকলের সারসংক্ষেপ শ্রবণ কর।

সংস্পর্শ ঘটে নাই, এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা কোথাও স্থান পায় নাই। কারণ, বেদান্তদর্শন-প্রণেতা বেদব্যাস এ গ্রন্থে তত্ত্ব-নিরূপণের জন্য যতটা প্রয়াস পাইয়াছেন, বাদি-পরাজয়ের পক্ষে ততটা মনোযোগ করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি নিজে বেদবিভাগ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া বেদবিদ্যায় আপনার পারদর্শিতার প্রমাণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার দ্বারা বেদবিরুদ্ধ কোনও কথা সন্নিবেশিত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কাজেই বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য তাঁহার পক্ষে অভ্যুপগমবাদ প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক হয় নাই। এই কারণে বেদান্ত-দর্শনের প্রামাণ্য ও গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বিশেষতঃ ভারতীয় আস্তিকগণের মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে, সেই সকল সম্প্রদায়ের প্রায় সকল আচার্য্যই বেদান্তদর্শনকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুগত করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং প্রায় সকলেই আপনাদের পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য ও দৃঢ়তা সংস্থাপনের সহায়তা কল্পে বেদান্ত-দর্শনের উপর টীকা টিপ্পনী ও ভাষ্য-ব্যাখ্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এরূপ সমাদর লাভের শুভ অবসর অপর কোনও দর্শনের ভাগ্যে ঘটে নাই; সুদূর ভবিষ্যতেও ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

অন্যত্র আছে—"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।

ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেক শরণৈর্ন্ৃভিঃ।

জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোঽংশো ন কশ্চন।

শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিসারং গতৌ হি তৌ॥"

(পরাশরীয়োপপুরাণ)

এ সকল শ্লোকের অর্থ সহজ ও সুবোধ্য,—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

যদিও আচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক মতভেদের ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে—বেদব্যাসের প্রকৃত অভিপ্রায় কোন্ দিকে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইতে পারে সত্য, তথাপি আচার্য্যগণের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যাঁহারা জ্ঞান-রাজ্যের পথপ্রদর্শক প্রাচীন আচার্য্যগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাহাই বেদব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়া সমাজে চালাইতে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু কোনও ব্যক্তির পক্ষেই মঙ্গলকর বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, যাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনা বলে আত্মসংযম পূর্ব্বক কোনও একটী সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লোকহিতার্থে জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে অগ্রে তাঁহাদেরই সাধনা-প্রণালীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের মধ্যে সকলেই তাদৃশ সাধনা-সম্পন্ন ও তদনুরূপ চিন্তাশীল না হইতে পারেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের নিকট হইতে তত্ত্ব-বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল আচার্য্যগণের তাদৃশ সাধন-সম্পত্তি থাকা কিছু বিস্ময়কর নহে। বিশেষতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এক একটী মত-বিশেষের উপাসনা করেন। তাঁহারা সেই বিশিষ্ট মতটীকেই গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে আগত মৌলিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন; * সুতরাং

* শিষ্যহিতার্থী গুরু সম্প্রদায় শিষ্যদিগের বোধশক্তি ও অনুষ্ঠানের ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া, যাহার পক্ষে যাহা কল্যাণকর ও

ঐ সমুদয় মতভেদও আর্ষ-চিন্তা ও প্রকৃত সত্যের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত একটা বিকট কল্পনা মাত্র নহে, পরন্তু সত্য ও সত্যলাভের সম্পূর্ণ সহায়। এই জন্যই গুরুশিষ্যভাবের প্রশংসা পূর্ব্বক উপনিষদ্ বলিতেছেন—

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।”

(ছান্দোগ্য ৪ ২ ৩)

তত্ত্ববিদ্যা আচার্য্য হইতে লব্ধ হইলেই সাধু ফল সম্পাদন করিয়া থাকে। এই কারণেই সম্প্রদায়শুদ্ধ বিদ্যার এত সম্মান ও সমাদর; আর সম্প্রদায়বিহীন শুদ্ধ কল্পনা প্রসূত ছিন্নমূল বিদ্যার প্রতি অত্যধিক অনাদর ও নিন্দা শাস্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা বিদ্বৎসমাজসম্মত সেই চিরন্তন পদ্ধতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যাহা করিতে হয় করিবেন; আমরা কিন্তু প্রাচীন আচার্য্যদিগকে সসম্মানে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাদের উপদেশেও বিশ্বাস করি; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিব, আচার্য্যদিগের মতানুসারেই বলিব। যদি তাহাতে কোথাও ভুলভ্রান্তি ঘটে, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা মার্জ্জনা করিবেন এবং তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়া উপকৃত করিবেন।

এ প্রবন্ধে আমি প্রাচীন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত-পদবী অনুসরণ করিব বলিয়াছি; কিন্তু আচার্য্য একজন নহেন—অনেক, এবং তাঁহাদের মতবাদও একপ্রকার নহে—বিভিন্ন প্রকার। এখন

গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তাহাকে তদ্বিষয়ে অনুরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। সেই কারণে একই গুরুর শিষ্যদিগের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষিত হয়। বুঝিতে হইবে, উঁহাদের প্রত্যেক মতই সত্যলাভের সম্পূর্ণ অনুকূল; সুতরাং কোনও মতটাই উপেক্ষণীয় নহে।

যায় না। বস্তুতঃ বেদান্ত-দর্শনের উপর যে সমস্ত ব্যাখ্যা বা ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শঙ্করের ব্যাখ্যায় যে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে, অপর কোনও ব্যাখ্যাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুণেই শঙ্করের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত জগতে এতদূর লোকপ্রিয় ও প্রভাবশালী হইতে পারিয়াছে। আমরাও এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ শঙ্কর-প্রদর্শিত সেই মতবাদেরই অনুসরণ করিব। আমরা যে সকল বিষয় বেদান্ত-সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, সে সকল বিষয় শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন,—এ কথা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি। তাঁহার মতে সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—এক—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ও "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি বাক্য প্রতিপাদিত ব্রহ্ম। উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ-পরিচয় ও উপাসনাদি প্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদ্ শাস্ত্র পরি-সমাপ্ত হইয়াছে। এই কারণেই উপনিষদ্ শাস্ত্র "ব্রহ্মবিদ্যা" নামে, আর উপনিষদের মীমাংসা-প্রকাশক বেদান্ত-দর্শন "ব্রহ্মসূত্র" নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে।

ব্রহ্মচিন্তার সহিত জীবের স্বভাবাদি চিন্তাও ঠিক সেইরূপই অপরিহার্য্য; কারণ, যতক্ষণ জীব ও জগতের প্রকৃত-তত্ত্ব যথা-যথভাবে নিরূপিত না হয়, ততক্ষণ বেদান্ত (বেদ) ব্রহ্মের অদ্বৈত-বাদও সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনির্ণীত হয় না বা হইতে পারে না। এই কারণে বেদান্ত-শাস্ত্রে ঐ উভয় চিন্তাও ব্রহ্মচিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া স্থান লাভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই প্রকার অপরিহার্য্যত্ব-বোধেই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বেদান্ত-শাস্ত্রের বিষয়-ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত

করিয়া আপনাদের কার্য্যপদ্ধতিরও পরিসর বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। উক্ত আনুষঙ্গিক বিষয় দুইটীকেও ব্রহ্মের সঙ্গে সমান আসনে স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

এখানে তাঁহারা ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ, এই তিনকেই বেদান্ত-বেদ্য তত্ত্বরূপে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের মধ্যেও ব্রহ্মের ন্যায় জীব ও জগতের সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এতদতিরিক্ত যে সকল বিষয় আলোচিত বা মীমাংসিত হইয়াছে, সে সকল বিষয় উক্ত বিষয়ত্রয়েরই অন্তর্নিবিষ্ট বা আনুসঙ্গিক বিষয় মাত্র।

উপরি-উদ্ধৃত সংগ্রহ-বাক্য-মধ্যে যদিও মায়ার কোনপ্রকার উল্লেখ বা নির্দ্দেশ নাই সত্য; তথাপি মায়ার কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বা অসম্বদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। কারণ, মায়াই ব্রহ্মের কার্য্যকারিণী-শক্তি, এবং দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চের একমাত্র উপাদান কারণ; সুতরাং মায়াবাদ বাদ দিলে অদ্বৈতবাদই অচল হইয়া পড়ে; এবং নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপযোগিতা ও অসত্য জগৎ-প্রপঞ্চের বিকাশ-সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং পৃথকভাবে নামোল্লেখ না থাকিলেও জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের কথাতেই মায়ার প্রসঙ্গ অপরিহার্য্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, এই জন্যই উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে স্বতন্ত্রভাবে মায়ার উল্লেখ করা হয় নাই। অতঃপর আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে যথাক্রমে ব্রহ্ম, মায়া, জীব ও জগৎ এই চারিটী বিষয়ের প্রধানতঃ আলোচনা করিব; এবং প্রসঙ্গতঃ অপরাপর বিষয়েরও যথাসম্ভব আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তের ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম বস্তু বেদান্তবেদ্য অতি দুর্ব্বোধগম্য হইলেও ভারতবাসীর নিকট নিতান্ত অপরিচিত বা অপ্রসিদ্ধ নহে। এ দেশে অজ্ঞ-বিজ্ঞ-নির্ব্বিশেষে প্রায় সকল লোকই ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন-না-কোনও প্রকার ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। এ ভাব যে অতি আধুনিক বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রচেষ্টার ফল, তাহা বলিতে পারা যায় না। পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই ভাব-ধারা স্মরণাতীত-কাল হইতে ভারতবাসীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবহমান রহিয়াছে।

প্রাচীন ঋষিগণ দয়াপরবশ হইয়া লোকহিতার্থে সেই চিরন্তন ভাবধারাকেই নিয়ন্ত্রিত করতঃ সুপথে পরিচালিত করিয়াছেন মাত্র। অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্র ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; ভারতবাসীর প্রত্যেক কার্য্যে ব্রহ্মচিন্তার অব্যাহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতবাসীর যে কোনও ধর্ম্ম-কর্ম্ম, যে কোনও সাধনা-পথ এবং যত প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম চিন্তার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। বলা বাহুল্য, এমন কোনও ধর্ম্মমত নাই, যাহার সঙ্গে ব্রহ্মচিন্তার সম্পর্ক না আছে। এমন কোনও সাধনা-পথ নাই, যেখানে ব্রহ্মচিন্তার অপেক্ষা অস্বীকৃত হইয়াছে; এবং এরূপ কোনও প্রামাণিক শাস্ত্রও নাই, যাহাতে ব্রহ্মচিন্তা স্থান-লাভে বঞ্চিত আছে। পক্ষান্তরে যে ধর্ম্ম ব্রহ্মলাভের যোগ্যতা জন্মায় না, যে সাধনা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অনুকূলতা করে না, এবং যে শাস্ত্র ব্রহ্ম-বোধে সহায়তা করে না; সে ধর্ম্ম, সে সাধনা ও সে শাস্ত্র যতই উত্তম ও যতই লোভনীয় হউক না কেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট তাহা কখনই উপাদেয় বোধে আদৃত হয় না বা হইতেও পারে না। এই জন্যই হিন্দুর ছোট-বড় সমস্ত শাস্ত্রই অল্পাধিক পরিমাণে ব্রহ্ম-

চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। * অনুসন্ধান করিলে আর্য্য-শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রচুর তত্ত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যদিও পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মচিন্তার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সন্নিবদ্ধ আছে, এবং ব্রহ্ম-নিরূপণের জন্য সে সকল স্থান হইতেই আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে সত্য; তথাপি আমরা সে পথে যাইব না এবং সে সুযোগ গ্রহণও করিব না। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ বেদান্ত-শাস্ত্রকেই আমাদের অবলম্বনীয় পথের সহায়রূপে গ্রহণ করিব, এবং আবশ্যকমত অপরাপর শাস্ত্রেরও যথাসম্ভব সাহায্য মাত্র লইব।

এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা এ বিষয়ে যাঁহার পদাঙ্কানু-সরণ করিতেছি, সেই আচার্য্য শঙ্কর স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন; তাঁহার সিদ্ধান্ত—অদ্বৈতবাদ, সম্পূর্ণরূপে বেদান্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—পুরাণাদির উপর নহে। কাজেই আমাদিগকে অনন্য-শরণ হইয়া বেদান্তের আশ্রয় লইতে হইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও অক্ষতদেহে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি লোক-হৃদয়ে জাগাইয়া

* পুরাণাদি গ্রন্থ ব্রহ্মকে, কোথাও ভগবান্, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও জ্ঞান বা চৈতন্য শব্দে, কোথাও বা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম শব্দেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ সমুদয় শব্দ ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। এ কথা ভাগবতে উক্ত আছে—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ২।১।৩

রাখিয়াছে। আশা করা যায়, যতদিন শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত না হইবে, ততদিন তাঁহার সে পুণ্যস্মৃতি লোকহৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না।

সত্যের অনুরোধে এখানে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সে কথাটা এই,—অনেকের বিশ্বাস, আচার্য্য শঙ্করই এ দেশের প্রথম অদ্বৈতবাদী; তিনিই সর্ব্বপ্রথম এ দেশে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এ কথা সত্য নহে। শঙ্করের পূর্ব্বে এবং পরে বহু অদ্বৈতবাদী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে আচার্য্য বোধায়ন, উপবর্ষ ও ভর্ত্তৃহরির নাম, এবং পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে আচার্য্য রামানুজ স্বামীর নাম সম্ভ্রমে উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁহাদের সহিত আচার্য্য শঙ্করের মতগত পার্থক্য ও বিশিষ্টতা এই যে, তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদের সহিত একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন, আর শঙ্কর সে পথেই যান নাই। তিনি দ্বৈতের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের মহিমা ও বিজয়বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন; এবং নিজের সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত করিয়াছেন। এখানেই তাঁহার বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাই তাঁহার নামকে জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সে যাহা হউক, অতঃপর অদ্বৈতবাদ কাহাকে বলে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক।

"দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে।"—দ্বিধা ইতং—'দ্বীতং', অর্থাৎ দ্বিধাযুক্ত—ভেদবিশিষ্ট। তস্য ভাবঃ—'দ্বৈতম' অর্থাৎ দ্বিধাভূত বা ভেদবিশিষ্টের ধর্ম্ম। তস্যাভাবঃ—'অদ্বৈতম্'। 'দ্বৈতের' (সর্ব্বপ্রকার ভেদের) অভাবই অদ্বৈত। 'বাদ' অর্থ

সিদ্ধান্ত; সুতরাং অদ্বৈতবাদ কথার অর্থ হইতেছে—দ্বৈতের অভাব বিষয়ক সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ যে সিদ্ধান্তে দ্বৈতের অসত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহাই অদ্বৈতবাদ।

আচার্য্য রামানুজও অদ্বৈতবাদী ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদ হইতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী; তাঁহার মতে সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ পরিত্যক্ত হইলেও, স্বগতভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। একটী বৃক্ষ স্বরূপতঃ এক হইয়াও যেরূপ অংশতঃ ভিন্ন ভেদযুক্ত,—উহার শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি অংশগুলি পরস্পর বিভিন্ন; অথচ ঐ সকল শাখা-প্রশাখাদি লইয়া বিশিষ্ট বৃক্ষটী এক; সেইরূপ ব্রহ্মও স্বরূপতঃ একই বটেন; কিন্তু ব্রহ্মের অংশ জীব ও জগৎ পরস্পর বিভিন্ন। * চেতনাচেতনাত্মক উক্ত জীব ও জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়। এই জন্য রামানুজ-সম্মত অদ্বৈতবাদের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ-সম্মত সিদ্ধান্তে সম্মতি দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত রূপে যে তিন প্রকার ভেদ জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাদের কোনও ভেদই ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। উক্ত তিন প্রকার ভেদ নিরাসের জন্যই শ্রুতিতে—'একম্'—'এব'—'অদ্বিতীয়ম্' এই তিনটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

* [illegible] স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥
তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণ দ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ॥" (পঞ্চদশী)।

'একং' শব্দে স্বগতভেদ, অবধারণার্থক 'এব' শব্দে সজাতীয় ভেদ, আর দ্বৈতবারক 'অদ্বিতীয়' শব্দে বিজাতীয় ভেদ নিবারিত হইয়াছে। ব্রহ্মেতে কোনপ্রকার ভেদ সম্বন্ধ থাকাই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; এমন কি, "গুণতোহপি নাদ্বৈত শ্রুতির্ভেদং সহতে"—'অদ্বৈত' শ্রুতি ব্রহ্মের গুণগত ভেদও সহ্য করে না। অতএব বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "সলীল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" "শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় ভাব স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। ব্রহ্মের এবম্বিধ নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়াই শঙ্করের সিদ্ধান্ত 'শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

জীব সম্বন্ধেও শঙ্কর মতে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই পদার্থ; কেবল মায়াকৃত ভ্রান্তিবশে পার্থক্য প্রতীত হয় মাত্র। জীব ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, আবার পরিশেষে ব্রহ্মেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং জীবের জীব-ভাব বা সংসারিত্ব মায়া-কল্পিত অসত্য। জীব-ভাবের ন্যায় জগদ্ভাবও মায়াকল্পিত মিথ্যা অসত্য অবস্তু। অগ্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া পরে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

* * *

ব্রহ্ম।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মনিরূপণে আমরা প্রধানতঃ বেদান্ত শাস্ত্রকেই সহায় ও প্রমাণ রূপে অবলম্বন করিব; কেন-না, বেদান্ত-

ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্বটী বোধগম্য হয় না ও হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত গুণ থাকিলে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে, সে সমুদয় গুণের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের) একটী গুণও ব্রহ্মেতে নাই। * সুতরাং প্রত্যক্ষের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বড়-জোর তাঁহার অস্তিত্ব মাত্র প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু তদগত অপর কোনও বিশেষ ভাব প্রমাণ করা অনুমানাদিরও অসাধ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি কিছু বিশেষ ভাব জানিতে হয়, তবে তাহা বেদান্তের উপদেশ হইতেই জানিতে হইবে, তদ্ভিন্ন আর কোনও পথই নাই। এই জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥"

(সাংখ্যকারিকা)।

অর্থাৎ, যে সকল পদার্থ 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান দ্বারাও জানিতে পারা যায় না; এরূপ পরোক্ষ (অতীন্দ্রিয়) পদার্থকে আপ্তবাক্য হইতেই জানিতে পারা যায়। বেদান্তাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য আপ্তবাক্য আর কি হইতে পারে? কাজেই ব্রহ্ম-বিষয়ে বাধ্য হইয়াই বেদান্তের আশ্রয় লইতে হয়।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের লক্ষণ দুইটী—'স্বরূপ লক্ষণ' ও 'তটস্থ লক্ষণ'। সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-সংস্পর্শ-শূন্য স্বরূপ-

* ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।"

অর্থাৎ যিনি (ব্রহ্ম) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিহীন, নিত্য, নির্ব্বিকার।

মাত্র দ্বারা যে পরিচয় প্রদান, তাহাই স্বরূপ লক্ষণের পরিচায়ক। যথা—"সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। 'সত্য' অর্থ—কোনও কালে, কোনও দেশে ও কোনও অবস্থায় যাহার বাধ বা বিনাশ নাই; চিরকালই একভাবে বিদ্যমান থাকে। 'জ্ঞান' অর্থ—চৈতন্য বা অনুভূতি; যাহা প্রদীপবৎ নিত্য স্বপ্রকাশ। 'আনন্দ' অর্থ—সুখ, যে সুখ নিত্য একপ্রকার এবং দুঃখ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। যদিও আপাতঃজ্ঞানে উক্ত সত্য জ্ঞান ও আনন্দ—এই তিনটী পৃথক ও স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি ঐ তিনটীকে এক অভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ
অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে।"—ভামতী।

অর্থাৎ—আনন্দ অনুভব (জ্ঞান) ও নিত্যত্ব, এই তিনটী ধর্ম্ম—চৈতন্য হইতে পৃথক্ না হইলেও, পৃথকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ তিনই চৈতন্যের বিভিন্ন আকারে স্ফুরণ মাত্র।

প্রসিদ্ধ 'সংক্ষেপশারীরক' গ্রন্থে এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া কথিত আছে—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্য ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতো দ্বয়ম্॥"

অর্থাৎ অস্তি (সৎ), ভাতি (জ্ঞান), প্রিয়ং (আনন্দ), রূপ (আকৃতি) ও নাম (মনুষ্য গো প্রভৃতি),—এই পাঁচটী বিষয় সাধারণতঃ আমাদের অনুভবগোচর হইয়া থাকে। জগতে তদতিরিক্ত কোনও বিষয় নাই—অনুভবেও ধরা যায় না। উক্ত পাঁচটী বিষয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং অপর

দুইটী জগতের স্বরূপ; অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দের অতিরিক্ত যেমন ব্রহ্ম নাই, তেমনই প্রসিদ্ধ নাম ও রূপের অতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, নাম-রূপই জগৎ। জগতে যে সত্তা ও আনন্দ প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সে সত্তা ও সে আনন্দ জগতের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; পরন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত। এই কারণে জাগতিক সত্তা ও আনন্দকে 'যাচিতমণ্ডন-ন্যায়' বলা হইয়া থাকে। * ফল কথা, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোথাও নাই; এই জন্য "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-কথিত লক্ষণই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। ইহা হইতেই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

ব্রহ্মের আর একটী লক্ষণ আছে; তাহার নাম 'তটস্থ-লক্ষণ'। 'তট' অর্থ তীর। সেই তীরস্থ বৃক্ষের ন্যায় যে লক্ষণ অচিরস্থায়ী, তাহাই তটস্থ লক্ষণ। যেমন—'জগৎ-কর্ত্তৃত্ব' প্রভৃতি। "জন্মা-

---

* 'যাচিতমণ্ডন' ন্যায়টী এই প্রকার,—কোনও ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত দরিদ্র গৃহিণীগণ সাধারণতঃ আত্মমর্য্যাদা রক্ষার আশায় প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে প্রয়োজনমত অলঙ্কারাদি বেশভূষা ভিক্ষা করিয়া লয় এবং সেই সমস্ত বেশভূষা পরিধান-পূর্ব্বক উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। যাহারা পরকীয় বেশভূষায় সুসজ্জিতা, সেই সকল রমণীর আভ্যন্তরিক অবস্থা জানে না, তাহারা যেমন ঐ সকল বেশভূষা সেই সকল রমণীর নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিয়া বিস্মিত হয়, তেমনি যাহারা মায়া ও জগতের তত্ত্ব জানে না, তাহারা ব্রহ্মলব্ধ জাগতিক সত্তা ও আনন্দ দর্শনে বিমোহিত হইয়া জাগতিক ভোগ করিতে সমুৎসুক হয়।

ত্যন্ত যতঃ” (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১), এবং “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।১।১) ইত্যাদি। এইরূপ জগৎপালকত্ব ও জগৎসংহারকত্বও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

এই যে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব, জগৎপালকত্ব ও জগৎসংহারকত্ব, অথবা এই জাতীয় আরও যে সমস্ত লক্ষণ আছে বা হইতে পারে, সে সমস্তই তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। কেন-না, এই সমস্ত লক্ষণ আপাততঃ ব্রহ্মের পরিচায়ক হইলেও চিরদিনের জন্য ব্রহ্মের পরিচায়ক হয় না ও হইতে পারে না। প্রলয়কালে জগৎ বা সৃষ্টিক্রিয়া কিছুই বর্ত্তমান থাকে না। কাজেই তৎকালে কর্ত্তৃত্ব ও পালকত্ব দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হয় না; সুতরাং তৎকালে ঐ দুইটী, লক্ষণ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে না। এইরূপ সৃষ্টিকালে সংহার-ক্রিয়া বিরত থাকায় জগৎসংহারকত্বও তাঁহার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এই কারণেই এই জাতীয় লক্ষণগুলিকে ‘তটস্থ লক্ষণ’ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, এবং তটস্থ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উভয়বিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্ম এক কি অনেক, সাবয়ব কি নিরবয়ব,—এতদুত্তরে উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কেবল একই নহেন; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পর্য্যন্ত তাঁহাতে নাই। এই অভিপ্রায়ে উপনিষদ্ কেবল ‘একং’ বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; সঙ্গে সঙ্গে অবধারণার্থক ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়ম্’ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত প্রকার ত্রিবিধ ভেদ

নিরাস পূর্ব্বক অদ্বিতীয়ত্ব সংস্থাপন করে বলিয়াই আচার্য্য শঙ্করের অভিমত সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম নির্ব্বিকার নির্লেপ নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী এবং এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। ইহাই শঙ্কর-মতের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতা লইয়াই তিনি দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অসত্যতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

* * *

ঈশ্বর।

জগতে ছোট বড় যত রকম বস্তু আছে, সকলের মধ্যেই উহাদের কার্য্যোপযোগী এক একটী বিশেষ শক্তি নিহিত আছে, দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক শক্তিই কার্য্যানুমেয়। কোন্ বস্তুতে কিরূপ শক্তি সন্নিবদ্ধ আছে, তাহা তাহার কার্য্য দর্শন ব্যতীত জানিবার বা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। বিশেষ বিশেষ কার্য্যই সেই সমুদয় বস্তুর শক্তি-বিশেষের অনুমাপক। ব্রহ্মাণ্ড যখন একটী বস্তু, সুতরাং তাহাতেও যে একটী বিশেষ শক্তি নিহিত আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

"শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।"
সত্ত্বশুদ্ধ-বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥ (পঞ্চদশী)॥

অর্থাৎ,—সর্ব্ববস্তুর নিয়ামিকা এক প্রকার ঐশী শক্তি আছে। ঐ শক্তি সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে সেই প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ

সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া, আর রজস্তমোগুণে অভিভূত মলিন সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা।

জগতে অন্যান্য বস্তুর শক্তি যেমন সকল সময়ে বস্তুর সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া থাকে না, ব্রহ্মের মায়াশক্তিও ঠিক তেমনি ব্রহ্মের সর্ব্বাংশ জুড়িয়া নাই। ঐ ব্রহ্মশক্তি (প্রকৃতি বা মায়া) জগৎ অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও, অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম হইতে অনেক ছোট—পরিচ্ছিন্ন। অনন্ত আকাশে এক খণ্ড সুবৃহৎ মেঘ উদিত হইলে তন্মধ্যস্থ জলে যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, ঠিক সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মের অভ্যন্তরে অবস্থিত উক্ত মায়া-শক্তির মধ্যগত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাগেও সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। * সেই মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর; আর মলিন সত্ত্বপ্রধান অবিদ্যার প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের নাম জীব।

"মায়া-বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ (জীবঃ), তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥"

(পঞ্চদশী)

জীবের কথা পরে বলা হইবে, এখন ঈশ্বরের কথাই বলা হইতেছে।

* অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ নীরূপ আকাশেরও প্রতিবিম্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, গভীর কূপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে আকাশস্থ মেঘমালা ও নক্ষত্ররাশি দৃষ্ট হয়, এবং আকাশে সে সকলের মধ্যে যতটা ব্যবধান থাকে, তাহাও অবিকল দৃষ্ট হয়। এই যে মেঘ ও নক্ষত্রাদির ব্যবধান ও তন্মধ্যগত অবকাশ, উহা বস্তুতঃ আকাশেরই প্রতিবিম্ব।

উক্ত প্রকার মায়া যেরূপ পরব্রহ্মে ঈশ্বর ভাব আনয়ন করে, ঠিক সেইরূপ পরমেশ্বরেও বিশ্ব-সৃষ্টির অনুকূল ক্রিয়াশক্তি সমুদ্বোধিত করে। ঈশ্বরে মায়া সম্বন্ধের অভাব হইলে, তাঁহার ঈশ্বরভাব যেমন বিলুপ্ত হয়, তেমনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াশক্তিও তাঁহার তিরোহিত হইয়া যায়। এইজন্যই বেদান্ত-শাস্ত্রে জীবভাব ও ঈশ্বরভাব—উভয়ই মায়াকল্পিত অনিত্য অবাস্তব বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

"মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।

যথেচ্ছ পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্তদ্বৈতমেব হি।" (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ, মায়ানামক কামধেনুর বৎস দুইটী—একটী জীব, অপরটী ঈশ্বর তাহারা উভয়ে ইচ্ছামত দ্বৈতদুগ্ধ পান করে করুক; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈতই তত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থ সত্য, দ্বৈত নহে।

উক্ত ঈশ্বরভাব মায়া-কল্পিত; সুতরাং কালপরিচ্ছিন্ন হইলেও অনাদি কোনও শুভ মুহূর্ত্তে যে মায়ার সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, এবং সেই সম্বন্ধের ফলে ব্রহ্মে ঈশ্বরভাব পরিকল্পিত হইয়াছিল, মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা অবধারণ করিতে পারে না; কাজেই অর্ব্বাচীন মানবের পক্ষে 'অনাদি' বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ব্রহ্মের ঈশ্বরভাব যেমন অনাদি, তেমনি আবার সান্ত বা বিনাশশীল। এমন এক সময় আসিবে, যখন জাগতিক অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ঈশ্বরের ঈশ্বরভাবও চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যাইবে,—উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। অবশ্য এ কথা কেবল শাস্ত্র ও তর্কের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়; কিন্তু অনুভব-গোচর করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং কবে যে সেরূপ দুর্দ্দিনের আবির্ভাব হইবে, তাহা ভাবিয়া কাতরতা-বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। অতঃপর ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি-প্রপঞ্চ

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। অতএব এখন আমরা সে বিষয়েরই অবতারণা করিতেছি।

* * *

ঐশী-সৃষ্টি।

আস্তিক দর্শনে ও তদনুগামী অন্যান্য শাস্ত্র মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বহুপ্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এই তিনটী মত প্রধান—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ।

* * *

আরম্ভবাদ।

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ আরম্ভবাদের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন,—সূক্ষ্ম অবয়ব সমষ্টির দ্বারা তদপেক্ষা স্থূল ও স্থূলতর কার্য্য আরব্ধ হইয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনও কার্য্যই সৎ বা বিদ্যমান থাকে না। সূক্ষ্ম অবয়বরাশি পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অভিনব কার্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কার্য্যগুলি উৎপত্তির পর নিজ নিজ আরম্ভক অবয়ব-সমূহকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এই মতে কারণীভূত অবয়ব-সমূহকে বলা হয়—আরম্ভক; আর তৎকার্য্য-সমূহকে বলা হয়—আরব্ধ। আরম্ভক কারণের অপর নাম—'সমবায়ী' কারণ। কর্ত্তা সেই সকল সমবায়ী কারণের উপর কার্য্যোৎপাদনক্ষম ব্যাপার উৎপাদন করিয়া থাকেন; এই জন্য ঐ সকল কার্য্যের কর্ত্তাকে বলা হয়—নিমিত্ত-কারণ। নিমিত্ত কারণ ও সমবায়ী (উপাদান) কারণের অতিরিক্ত আরও একটী কারণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। তাহার নাম—'অসমবায়ী' কারণ। অসমবায়ী কারণ সাধারণতঃ গুণ ও ক্রিয়া ব্যতীত আর কেহ হয় না। অসমবায়ী কারণ সমবায়ী কারণে

বিদ্যমান থাকিয়াই কার্য্যোৎপাদন করিয়া থাকে; কোথাও এ নিয়মের অন্যথা হয় না। অসমবায়ী কারণের অভাব হইলে কোনও কার্য্যই বর্ত্তমান থাকে না বা থাকিতে পারে না। কিন্তু সমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণের অভাবে সর্ব্বত্র কার্য্য ধ্বংস হয় না। একটী উদাহরণের দ্বারা বিষয়টী পরিস্কার করিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রসিদ্ধ মৃণ্ময় ঘট একটি কার্য্য। কুম্ভকার 'কপাল' ও 'কপালিকা' নামক দুইটী অংশকে একত্রিত করিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরকে সংযোজিত করিয়া 'ঘট' নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এস্থলে কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, 'কপাল' ও 'কপালিকা' অংশ দুইটী আরম্ভক বা সমবায়ী কারণ, আর সেই 'কপাল' ও 'কপালিকা'র সংযোগ হইতেছে—'অসমবায়ী' কারণ। কেন-না, ঐ সংযোগের সদ্ভাবেই ঘটের সদ্ভাব। আর উহার অভাবেই ঘটের অসদ্ভাব বা ধ্বংস সুনিশ্চিত।

উপরে আরম্ভবাদ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদত্ত হইল, আলোচ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্বন্ধেও তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। এই যে, বিশাল বিশ্ব-প্রপঞ্চ, যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, ইহাও এক সময়ে (প্রলয়কালে) অসৎ বা অবিদ্যমান ছিল, পরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি-প্রভাবে পরমাণুপুঞ্জ হইতে দ্ব্যণুক এসরেণুক্রমে বিশাল বিশ্বরাজ্য রচনা করিয়াছেন। *

* পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু—এই চারি ভূতের চারি-প্রকার পরমাণু আছে। পরমাণু-সমূহ নিত্য, প্রলয়কালেও উহাদের ধ্বংস হয় না। দুই দুইটী পরমাণুর সংযোগে এক একটী দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয়, আবার দুই দুইটী দ্ব্যণুকের সংযোগে একটী ত্রসরেণুর উৎপত্তি হয়, ইত্যাদি।

এ মতে দুইটী পরমাণু হয়,—একটী দ্ব্যণুকের 'আরম্ভক' বা 'সমবায়ী' কারণ; আবার দুই দুইটী দ্ব্যণুক হয়—একটী ত্রস-রেণুর আরম্ভক। ঐ পরমাণুদ্বয়ের যে সংযোগ (যাহার দ্বারা দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয়), তাহা 'অসমবায়ী' কারণ, আর স্বয়ং পরমেশ্বর উহাদের 'নিমিত্ত' কারণ। আরম্ভবাদে কার্য্যসৃষ্টি সম্পূর্ণ অভি-নব। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে কারণের (সমবায়ী কারণের) সহিত কার্য্যের কোনপ্রকার সম্বন্ধ ছিল না ও থাকিবে না; সুতরাং কার্য্য ও কারণ এক অভিন্ন বস্তু নহে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব 'আরম্ভবাদে' কার্য্য-কারণের অভিন্নভাব সিদ্ধ হয় না, এবং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যেরও সহজে অর্থ-সঙ্গতি হয় না। এই ভয়ে সাংখ্যসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ 'পরিণামবাদের' আশ্রয় লইয়া থাকেন।

* * *

পরিণাম-বাদ।

তাঁহারা বলেন, কার্য্য কখনও স্বীয় উপাদান কারণ (সমবায়ী কারণ) হইতে পৃথক নহে; পরন্তু উপাদান-কারণই অবস্থা-ভেদে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে; এইজন্য কার্য্য-মাত্রই কারণ হইতে অ পৃথক্ বস্তু। জগতে "নাসদুৎপদ্যতে, ন চ সদ্বিনশ্যতি" অর্থাৎ যাহা অসৎ—অবিদ্যমান—আকাশকুসুম-সদৃশ, তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না। আর যাহা সৎ—বাস্তবসত্তাযুক্ত, তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। সৎ বস্তু চিরকালই আছে ও থাকিবে, আর যাহা অসৎ—বাস্তব-সত্তাবিহীন, তাহা কস্মিন্ কালেও শত-প্রযত্নেও আত্মলাভ করে না ও করিতে পারে না,—ইহাই অবিসম্বাদিত নিয়ম। কখনও এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই ও হইবে না।

এই নিয়মানুসারে সাঙ্খ্যবাদিগণ বলেন,—আরম্ভবাদীর অভিমত—পরমাণুপুঞ্জ জগৎপ্রপঞ্চের মূল কারণ নহে; মূল কারণ (উপাদান কারণ) হইতেছে—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই গুণত্রয়ের সমষ্টিগত নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতির অপর নাম 'প্রধান'। * এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জীবগণের কর্ম্ম-বশে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম ক্রমে এই বিশাল বিশ্ব-প্রপঞ্চের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মতে ঈশ্বর বা অন্য কেহ প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; পরন্তু প্রকৃতিই জগদাকার ধারণপূর্ব্বক বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রলয়কালে এই সকল নামরূপ ভেদ বিলুপ্ত হইলে পর, উক্ত মূল প্রকৃতিই আবার সাম্যাবস্থায় অবস্থান করিবে। পরিণামবাদী আচার্য্যগণ এতদনুকূল বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া আপনাদের সিদ্ধান্তের সারবত্তা সমর্থন করিয়া থাকেন।

* * *

বিবর্ত্তবাদ।

অতঃপর বিবর্ত্তবাদের কথা। বিবর্ত্তবাদ প্রধানতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর নিজে প্রকৃতপক্ষে

---

* সাংখ্যমতে ত্রিগুণের পরিচয় এই প্রকার—

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।

গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" (ঈশ্বরকৃষ্ণ)

সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—লঘুত্ব ও প্রকাশ, রজের ধর্ম্ম—উত্তম্ভন ও চঞ্চলতা, আর তমের ধর্ম্ম—গুরুত্ব ও আবরণ। ইহারা মিলিতভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

বিবর্ত্তবাদী ছিলেন কি পরিণামবাদী ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন। কারণ, তৎসম্বন্ধেও আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রকার মতভেদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া উপহাসস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন,—

"কৃপণধীঃ পরিণামমুদীক্ষতে, ক্ষয়িতকল্মষধীস্তু বিবর্ত্ততাম্।"

এখানে পরিণামবাদীকে 'কৃপণধী' বলা হইয়াছে, আর বিবর্ত্ত-বাদের পক্ষপাতীকে 'ক্ষয়িতকল্মষধী' অর্থাৎ বিমলবুদ্ধি বলা হইয়াছে। অবশ্য, উপরি উদ্ধৃত বাক্যের তাৎপর্য্য লইয়াও আবার ব্যাখ্যাতৃবর্গের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলেন,—উক্ত বাক্যের যথাশ্রুত অর্থেই তাৎপর্য্য; আবার কেহ কেহ বলেন,—উহা পরিহাস-বাক্য, সুতরাং যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ না করিলে উহার তাৎপর্য্য ব্যাহত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিবর্ত্তবাদের পক্ষকে নিন্দা করিয়া পরিণামবাদের পক্ষকে প্রশংসা করাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

সে যাহা হউক, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ যাহাই হউক, আচার্য্যের অভিপ্রায় লইয়া যে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং এ বিষয় লইয়া আর অধিক বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। তবে এ কথা খুবই সত্য যে, অধ্যাসবাদ যেমন আচার্য্য শঙ্করের তীক্ষ্ণ-মনীষার অদ্ভুত আবিষ্কার, আলোচ্য বিবর্ত্তবাদও তেমনি তাঁহার সূক্ষ্মচিন্তাবৃত্তির অতুলনীয় ফল। তাঁহার উপদেশাবলী আলোচনা করিলে, সে কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই কারণেই কোন কোন আচার্য্য উভয় সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষাকল্পে পরিণাম-বাদ ও বিবর্ত্তবাদ উভয়েরই পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মকে বিশ্ব প্রপঞ্চের বিবর্ত্তকারণ বলিয়াছেন, আর মায়োপহিত অশুদ্ধ ব্রহ্মকে (ঈশ্বরকে) পরিণাম-কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধ (তুরীয়-পদবাচ্য) ব্রহ্মের তুলনায় এই জগৎ বিবর্ত্ত, আর মায়োপহিত ব্রহ্মের তুলনায় পরিণামরূপে পরিগৃহীত হওয়ায় উভয় বাদই তুল্যরূপে সমাদৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদ হইতে বিবর্ত্তবাদের বিশিষ্টতা এই যে, পরিণামস্থলে এক বস্তু স্বীয় আকারাদগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকারে প্রকটিত হয়। তৎকালে তাহার আর পূর্ব্বতন আকার বা স্বরূপ বিদ্যমান থাকে না; সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কিন্তু বিবর্ত্তস্থলে সেরূপ কিছু হয় না। যে বস্তু যে প্রকার রূপ ও স্বভাব সম্পন্ন, সে বস্তু সেইরূপে ও সেই স্বভাবেই বিদ্যমান থাকে, অথচ দর্শক ব্যক্তি সেই বস্তুকে অন্য প্রকারে দর্শন করে—অন্য বস্তু বলিয়া মনে করে। অবশ্য, অজ্ঞানই তথাবিধ ভ্রান্তি-সমুৎপাদনের বীজ বা মূল কারণ। *

উক্ত বিবর্ত্তবাদ-সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, কূটস্থ ব্রহ্ম এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের কারণ সত্য; কিন্তু কুম্ভকার যেরূপ ঘটাদি কার্য্যের কারণ, তিনি সেরূপ কারণ নহেন; পরন্তু কোনপ্রকার বাহ্য উপাদান সংগ্রহ না করিয়াই, এবং নিজে কোনপ্রকার বিকার প্রাপ্ত না হইয়াই—অবিকৃত থাকিয়াই দৃশ্যমান জগদাকারে প্রকাশ পাইতে-

---

* "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

অর্থাৎ,—কোনও বস্তুর যে স্বরূপতই অন্যপ্রকারে প্রকাশ, তাহার নাম পরিণাম; আর স্বরূপের অন্যথাভাব ব্যতিরেকেই যে অন্যাকারে প্রকাশ, তাহার নাম—বিবর্ত্ত।

ছেন; অথবা তিনি নিত্য নির্ব্বিকারভাবে বিদ্যমান থাকিলেও জীবগণ অনাদি-বাসনাবশে তাঁহাকে দেখিতে বা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তিময় বিশাল বিশ্বমাত্র দর্শন করিয়া থাকে। এবম্বিধ অধ্যাসের ফলে, অধ্যাসাশ্রয় ব্রহ্মে জাগতিক দোষগুণ বিন্দুমাত্রও সংক্রামিত হয় না। আচার্য্য বলিয়াছেন,—"যত্র যদধ্যাসঃ, তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণাপি ন স সম্বধ্যতে।" (অধ্যাসভাষ্য); সুতরাং ভ্রান্তির বশবর্ত্তী জীবগণ ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করিলেও প্রকৃত-পক্ষে সেই জগৎ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই ব্রহ্মের বিশুদ্ধতাও ব্যাহত হয় না। ইহাই সাধারণতঃ বিবর্ত্তবাদের বিশিষ্টতা।

উল্লিখিত বাদত্রয়ের মধ্যে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ উভয়ই অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের পথে আদৌ অনুকূল নহে। কারণ, উক্ত উভয়বাদই কার্য্য ও কারণের ভেদ-সাপেক্ষ; সুতরাং দ্বৈতবাদেরই সম্পূর্ণ সমর্থক। উহাদের যে কোনও একটী পক্ষ গ্রহণ করিলেও জগতের অসত্যতা প্রমাণিত হয় না, এবং জগৎকারণ ব্রহ্মের শ্রুতিসম্মত বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষ-কারণতাও সংরক্ষিত হয় না; সুতরাং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ব্রহ্ম সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত), এবং "তদৈক্ষত ... বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব—জন্মিব) ইত্যাদি অদ্বৈতবোধক শ্রুতি-বাক্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বোক্ত বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল দিকই রক্ষা পাইতে পারে। একদিকে ব্রহ্মের জগৎকারণতা, নির্ব্বিকারতা ও বিশুদ্ধ অদ্বিতীয়তা যেমন রক্ষা পায়, তেমনিই আবার অপরদিকে পারমার্থিক সত্তার অভাবেও জগতের ব্যবহারিক সত্যতা রক্ষা করা যায়। এই কারণেই

পূর্ব্বোক্ত বিবর্ত্তবাদটী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের এত প্রিয় ও আদরের বস্তু হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদ বাদ দিলে শঙ্করসম্মত অদ্বৈত-বাদ একেবারে অসম্ভব না হইলেও অনায়াসসাধ্য যে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এতদনুসারে বেদান্তের ঈশ্বর বা মায়োপহিত ব্রহ্ম এককই বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। বিশ্বরচনার জন্য তাঁহাকে আর বাহির হইতে কোনপ্রকার উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় নাই। প্রসিদ্ধ লূতাকীট (মাকড়শা) যেরূপ বাহ্য উপাদান না লইয়াই আপনার শরীর ও চৈতন্যের সাহায্যে সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বরও স্বীয় চৈতন্য ও মায়া-শক্তির সাহায্যে দৃশ্যমান বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাহার জন্য আর কোনও বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করেন না। দৃষ্টান্তস্থলে লূতাকীটের শরীর হয় উপাদান-কারণ, আর তাহার জ্ঞানশক্তি হয় নিমিত্ত-কারণ; অর্থাৎ মাকড়শা স্বীয় জ্ঞানশক্তির প্রভাবে আপনার জড়দেহ হইতে সূত্ররাশি নিষ্কাশিত করে, আর আলোচ্য-স্থলে পরমেশ্বর স্বীয় নিরঙ্কুশ চৈতন্য-প্রভাবে শরীরস্থানীয় মায়াকে জগদাকারে পরিনমিত করেন; কাজেই তাঁহার উভয় প্রকার কারণতাই সিদ্ধ হয়। ইহাও অদ্বৈতবাদের অপর একটী বিশিষ্টতা।

উপরে যে পরমেশ্বরের কথা বলা হইল, তিনিই বিশ্ব-সৃষ্টির একমাত্র কর্ত্তা, এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রলয়াবসানে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা জাগরিত হয়। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজা-য়েয়"—তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব—আমি জন্মিব। তিনি অমোঘসংকল্প; সংকল্পমাত্রেই তিনি তেজঃ প্রভৃতি ভূতবর্গের

সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর ইচ্ছা করিলেন যে, "অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।"—আমি এই জীবাত্মারূপে এই সৃষ্ট ভূতবর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক এ সকলের নাম ও রূপ অর্থাৎ বাচক শব্দ আকৃতিভেদ প্রকটিত করিব। এই প্রকার সংকল্পের পর তিনি নিজেই জীবভাবে প্রকটিত হইয়া স্বকৃত পঞ্চভূতের নাম ও আকৃতি প্রকাশ করিলেন, এবং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" সৃষ্টির পর নিজেই সে সমুদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাদি।

এ সকল কথার দ্বারা স্বয়ং শ্রুতিই ভঙ্গীক্রমে দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অসত্যতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। কেন-না, সত্য বস্তু মাত্রই স্বপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সত্যবস্তু কখনও আপনার অবস্থিতির জন্য অপর কাহারও অপেক্ষা করে না, অবাস্তব অসত্য পদার্থের অবস্থা অন্যরূপ। সে কখনও কোনও একটী সত্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। অসত্য বা ভ্রান্তিকল্পিত সর্প কখনও রজ্জু বা তথাবিধ কোনও একটী সত্য পদার্থকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। জগৎ যদি যথার্থই সত্য স্বপ্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে কখনই তন্মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার আবশ্যক হইত না এবং প্রবেশও সম্ভব হইত না। পরমেশ্বরের প্রবেশ হইতেই অনুমান করা যায় যে, সত্যপদার্থে অধিষ্ঠান ব্যতীত অসত্যের স্থিতি সম্ভবপর হয় না বলিয়াই পরমেশ্বর নিজে অধিষ্ঠানরূপে আশ্রয় দিয়া অসত্য জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের উপদেশ হইতেই জানিতে পারা যায় যে, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর প্রথমতঃ তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই তিনটীমাত্র ভূত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেখানে আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির

কোনও কথাই নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেখানে ভূতসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সেখানে অপর ভূতত্রয়ের সঙ্গে আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির কথাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র এই উভয় প্রকার শ্রুতির সমাধান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যদিও ছান্দোগ্যোপনিষদে সৃষ্টি-প্রকরণে আকাশ ও বায়ুর উল্লেখ নাই, তথাপি উহাদের উৎপত্তি ছান্দোগ্যশ্রুতির অনভিপ্রেত বা বিপ্রতিষিদ্ধ নহে। কারণ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে যখন "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" * ইত্যাদি-ক্রমে স্পষ্টাক্ষরে বায়ু ও আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত আছে, তখন "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি স্থলে "আকাশং বায়ুং চ সৃষ্ট্বা তৎ (ব্রহ্ম) তেজঃ অসৃজত" এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রুতির ন্যূনতা পরিহারপূর্ব্বক সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। ফলকথা, বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সকলেই উক্ত ব্যাখ্যার অনুমোদন করিয়াছেন ও করিবেন এবং পঞ্চভূতের উৎপত্তি বিষয়ে একমত হইয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

উপরে, যে পঞ্চভূতের উৎপত্তি-বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহা ব্যবহারোপযোগী স্থূল-ভূত নহে—অতি সূক্ষ্ম জীবগণের ব্যবহারের অযোগ্য; সুতরাং সে সকল ভূতের সাহায্যে জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ বিচিত্র ফলভোগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ জীবগণের ভোগ-সম্পাদনই ভূত-সৃষ্টির মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন সেই

* সেই পূর্ব্বকথিত আত্মা (পরমেশ্বর) হইতে প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হইল, ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল।

ভূতবর্গ যদি জীবগণের ভোগে না আইসে, তাহা হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই কারণে—

"তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য ভোগায়তনজন্মনে।

পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥" (পঞ্চদশী)

জীবগণের কর্ম্মানুরূপ ভোগসাধনের জন্য এবং ভোগায়তন অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ কর্ম্মফল ভোগ করিবে, সেই ভোগাধিষ্ঠান দেহ রচনার উদ্দেশ্যে ভগবান্ (পরমেশ্বর) স্বকৃত আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটীকে পঞ্চীকৃত বা পঞ্চাত্মক করিলেন।

অভিপ্রায় এই যে, সূক্ষ্ম-দেহে * অধিষ্ঠিত জীবের কোন প্রকার স্থূল-ভোগ সম্ভবপর হয় না; স্থূল-ভোগের জন্য স্থূল দেহের আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে স্থূল দেহে থাকিয়া সূক্ষ্ম-ভূতের উপভোগ

* সূক্ষ্মশরীরের পরিচয় এই প্রকার—

"পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্।

অপঞ্চীকৃত-ভূতোত্থং সূক্ষ্মং ভোগ্যলিঙ্গমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান ভেদে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি,—এই সপ্তদশ অবয়বে রচিত দেহই সূক্ষ্ম-দেহ ও লিঙ্গদেহ নামে কথিত হয়। এই সূক্ষ্মদেহ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন এবং মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিলোপ ঘটে। সূক্ষ্মদেহই জীবের ভোগাপবর্গ-সাধন। সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়াই জীবগণ সাধারণতঃ জন্ম মরণ স্বর্গ নরক এবং ভোগ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের স্বরূপতঃ জন্মমরণাদি ধর্ম্ম না থাকিলেও সূক্ষ্মদেহের জন্মমরণাদি লইয়াই জীবের জন্মমরণাদি অবস্থা কল্পিত হইয়া থাকে।

করাও জীবের পক্ষে অসম্ভব হয়। এই জন্য প্রথম-সৃষ্ট সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চভূতের স্থূলত্ব-সম্পাদন করার আবশ্যক হয়। পঞ্চীকরণই সেই স্থূলতা-সম্পাদনের একমাত্র উপায়। সেই জন্যই পরমেশ্বর ঐ সকল ভূতের পঞ্চীকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চীকরণ অর্থ—পঞ্চাত্মককরণ; অর্থাৎ অবিমিশ্রিত এক একটী ভূতকে অপরাপর চারি ভূতের সহিত মিশ্রিত করা। তাহার ফলে আর চারিটি ভূতের অংশের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেক ভূতই পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতরূপে পরিণত হয়।

পঞ্চীকরণের প্রণালী এইরূপ—প্রথমতঃ পঞ্চভূতের প্রত্যেক-টীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশকে আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। অনন্তর এই চারি ভাগের এক এক ভাগকে অপরাপর ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত মিলিত করিলেই সেই অর্দ্ধাংশগুলি পঞ্চীকৃত হইয়া পড়ে। * সেই পঞ্চীকৃত ভূতবর্গ হইতেই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবদেহ ও ভোগ্য বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আকাশ বায়ু প্রভৃতি যে কোনং ভূত ও ভৌতিক পদার্থ আমাদের উপলব্ধিগোচর হইয়া

---

* "দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চপঞ্চতে॥"

অর্থাৎ,—এক একটী সূক্ষ্ম ভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক অর্দ্ধভাগকে আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহাদের (চারি ভাগের) এক একটী ভাগকে অপরাপর ভূতের অর্দ্ধভাগের সহিত মিলিত করিলেই ঐ পঞ্চভূতের অর্দ্ধাংশগুলি পঞ্চাত্মক হইয়া থাকে।

থাকে, তাহার কোনটীই অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ভূত বা ভৌতিক পদার্থ নহে ;—সকলই বিমিশ্র পঞ্চভূতাত্মক। অতএব দৃশ্যমান জগৎ-টাকেই পঞ্চীকৃত বা পঞ্চাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, মায়া-সম্বলিত পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় মায়ার সাহায্যে আপনার আমোঘ সঙ্কল্প দ্বারা এই দৃশ্য-জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত ঐশী মায়াকে সৎ বা অসৎ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না; এই জন্য উহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিতে হয়। মায়া অসৎ—আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অসত্য বা অবস্তু হইলে তাহা হইতে কোনপ্রকার কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মের ন্যায় সৎ—কূটস্থ সত্য পদার্থ হইলেও উহার কালবশে অত্যন্ত উচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব হয়, এবং তদুৎপন্ন জগৎও চিরকাল অক্ষত দেহে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। অথচ, মায়া ও মায়িক জগতের ধ্বংস বা উচ্ছেদ সর্ব্বজন-বিদিত। এই কারণে ঐশী মায়াকে 'অনির্ব্বচনীয়' একটী ভাবপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বেদান্ত-শাস্ত্র বাধ্য হইয়াছেন।

* * *

সৃষ্টি।

ব্যবহার-জগতে দেখা যায়, মায়াপটু ঐন্দ্রজালিক স্বীয় শক্তি-প্রভাবে বিচিত্র মায়াজাল বিস্তার করে, এবং অজ্ঞ দর্শকমণ্ডলী সভৃষ্ণনয়নে সে দৃশ্য দর্শন করিয়া থাকে। সেখানে সে সকল মায়িক পদার্থ প্রকৃতপক্ষে অসত্য হইলেও, অজ্ঞ দর্শকমণ্ডলী যেমন সে সকলকে সত্য মনে করিয়া বিমুগ্ধ হয়; এবং ঐ ঐন্দ্রজালিকই যেমন সে সকল মায়াময় পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, অবস্থা-ত্রয়ের একমাত্র আশ্রয়; ঠিক তেমনই সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর স্বীয়

মায়াশক্তি-প্রভাবে এই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশ করেন; এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, তিন অবস্থাই সে সকলের একমাত্র আশ্রয়। সেই আশ্রয়ের সত্তা বা অস্তিত্ব লইয়াই দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব। অথচ এ সকল পদার্থ (জগৎ) মায়াকল্পিত—অসত্য হইলেও অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যগণ সত্যবোধে গ্রহণ করিয়া থাকে। মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত (স্বতন্ত্র সত্তা-রহিত) তৎপ্রদর্শিত দৃশ্যাবলী যেমন অসত্য—মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, তেমনই স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানে অক্ষম পরমেশ্বরাশ্রিত মায়া জগৎও স্বাধীনসত্তাবিহীন বলিয়া বিবেকী পুরুষ ইহাকে অসত্য—মিথ্যা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল দৃশ্য পদার্থ উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস—এই তিন অবস্থায়ই পরাপেক্ষিত বা পরাশ্রিত, সে সকল পদার্থ যেমনই হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে উহাদের স্বাধীন সত্তা কখনও নাই; কেবল আশ্রয়ের সত্তা লইয়াই উহারা সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই জন্য উহারা মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে,—মৃণ্ময় ঘট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, উৎপত্তির পরেও মৃত্তিকায়ই অবস্থিত, এবং ধ্বংসের পরেও মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়। এই ভাবে উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস, এই অবস্থাত্রয়েই মৃত্তিকার আশ্রিত বলিয়া ঘট-রূপে ঘট যেমন অসত্য, অর্থাৎ মৃত্তিকার সত্তা লইয়াই ঘটের সত্তা, উহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এবং নাই বলিয়াই ঘট যেমন অসত্য ও মিথ্যা হইয়া থাকে, ঠিক তেমনই পরিদৃশ্যমান জড় জগৎও স্বীয় উপাদান-কারণ ব্রহ্মে চিরকাল সমাশ্রিত অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি ও ধ্বংস এই তিন অবস্থায়ই ব্রহ্ম-সত্তার অধীন। এই কারণে দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চকেও

অসত্য বা মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জগৎপ্রপঞ্চ কখনই আকাশকুসুম বা শশ-শৃঙ্গের ন্যায় অলীক বা অত্যন্ত অসৎ পদার্থ নহে এখানেই শঙ্করসম্মত অদ্বৈতবাদের সহিত বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ-মতের মহৎ পার্থক্য। *

* * *

জীব।

যাহার জন্য সেই নির্ব্বিকার নিঃসঙ্গ পরম পুরুষেরও অভিনব ইচ্ছাশক্তির সমুদ্রেক হইয়াছিল, এবং বহুধা বিভক্ত হইয়া জন্ম-পরিগ্রহের অভিলাষ জন্মিয়াছিল—"তদৈক্ষত বহুস্যাং—প্রজায়েয়"; যাহার ভোগোপযোগী দ্রব্যসম্ভার ও ভোগসাধন দেহযন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য এত আয়োজন—অধিকন্তু অনন্ত বৈচিত্র্যধাম এই বিশাল বিশ্বচিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে; সেই জীবের স্বরূপ ও জন্মমরণাদি ব্যবহারের প্রকৃত তত্ত্ব কি ও কি প্রকার, তাহা না বলিলে বক্তব্য বিষয় শেষ হয় না, এবং জিজ্ঞাসুর আকাঙ্ক্ষাও পরিসমাপ্ত হয় না। এইজন্য এখন জীবতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা অতঃপর জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

* বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, কোনও দৃশ্য পদার্থেরই বাহিরে অস্তিত্ব নাই। অন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই উহাদের আকর বা উৎপত্তি-স্থান। অন্তরে যখন যেরূপ বুদ্ধি-সংস্কার জাগিয়া উঠে, তখন সেরূপই বস্তুর ছবি বাহিরে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বাহিরে সে সকলের কোনরূপ অস্তিত্বই নাই। অস্তিত্ব না থাকিলেও অবিদ্যা-বশতঃ লোকে সে সকল বস্তুর অস্তিত্ব ভ্রম করিয়া থাকে। স্বপ্নদৃশ্য ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত-স্থল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্পই আছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে সে প্রভেদও আবার বাস্তব নহে, উহা অবিদ্যা-কল্পিত মিথ্যা বা অসত্য। অসত্য ভেদ কখনই বস্তুর পারমার্থিক ঐক্য অপনয়ন করিতে পারে না।

ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, 'সেই পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব—জন্মিব'—"তদৈক্ষত বহুস্যাং—প্রজায়েয়।" তাহার পর তিনি আপনার অমোঘ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন। কেবল ভূত সৃষ্টি করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আরও কর্ত্তব্য তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। তিনি পুনশ্চ সঙ্কল্প করিলেন,—"হন্ত অহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি"—আমি এই জীবরূপে উক্ত তিন দেবতার অর্থাৎ পঞ্চভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব, অর্থাৎ ঐ সকল ভূতকে স্থূলাকারে পরিণত করিয়া উহাদিগকে বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা প্রদান করিব ইত্যাদি।

এখানে দেখা যায়, স্বয়ং পরমেশ্বরই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তিনিই জীবভাবে স্বকৃত ভূত ভৌতিক পদার্থনিচয় উপভোগ করিতেছেন। ইহা ছাড়া "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জীব ও ব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই বস্তু; কেবল অনাদি অজ্ঞানবশে উভয়ের মধ্যে ভেদ কল্পিত হয় মাত্র। এখানে বলা আবশ্যক যে, কেবল আচার্য্য শঙ্করই যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদ অবলম্বন করিয়া আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু প্রাক্

সকল বৈদান্তিক আচার্য্যই জীব ব্রহ্মের অভেদবাদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা অভেদের সহিত ভেদের সমন্বয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। * ফল কথা, জীব যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এ বিষয়ে সকলেই সমস্বরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ স্থলে আচার্য্য রামানুজ, ভট্টভাস্কর ও মধ্ব প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, জীবব্রহ্মের অভেদবাদই বেদান্ত-শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন, কি প্রকারে যে অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের জীবভাব আবির্ভূত হয়, অতঃপর তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেমন বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেও একটী বিচিত্র শক্তির সদ্ভাব শাস্ত্রানুশাসন হইতে জানিতে পারা যায়। ঐ শক্তির পরিচয়-প্রসঙ্গে বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন,—

"শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ, দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে॥"

* আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ জীব হইতে ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন বা ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলেও অত্যন্ত অভেদ বা জীবাবস্থায় তাঁহার ব্রহ্মভাব স্বীকার করেন না; অধিকন্তু জীবব্রহ্মের বিভাগকেও উচ্ছেদশীল বা বিনাশী বলিয়া মানেন না। তাঁহারা ঐ বিভাগকে অনাদি অনন্ত বলেন, এবং মুক্তিকালেও সে বিভাগ অক্ষুন্ন থাকিবে বলিয়া বর্ণনা করেন; সুতরাং এ সমস্ত অংশে শঙ্কর-মতের সহিত তাঁহাদের মতের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী উক্ত প্রকৃতিই মায়া-শব্দ বাচ্য। শঙ্করের মতে উক্ত মায়া অনির্ব্বচনীয় পদার্থ; উহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। মায়া সৎ (পরমার্থ সত্য) হইলে মায়াময় জগতের কখনও উচ্ছেদ সম্ভবপর হইত না; আবার অসৎ হইলেও তাহা হইতে কোন প্রকার কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইত না; কাজেই মায়াকে সদসদনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মায়া, প্রকৃতি ও অবিদ্যা, এই তিনটী শব্দ প্রকৃতপক্ষে তুল্যার্থ-বোধক হইলেও, বিদ্যারণ্য স্বামী ব্যাখ্যানসৌকর্য্যার্থ একই প্রকৃতির মায়া ও অবিদ্যা নামে দুইটী বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ উভয়ের স্বরূপগত প্রভেদও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।" প্রকৃতির যে অংশ সত্ত্বগুণাধিক, সেই অংশ 'মায়া', আর যে অংশ তমোগুণ-প্রধান, সেই অংশে 'অবিদ্যা'-নামে পরিচিত। এবংবিধ বিভাগ যে সকল অদ্বৈতবাদীই মানিয়া লইয়াছেন, তাহা নহে; স্বয়ং বিদ্যারণ্য স্বামীও সর্ব্বত্র এই বিভাগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। তৎকৃত 'পঞ্চদশী' নামক গ্রন্থ দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, বিদ্যারণ্য স্বামী উক্ত প্রকার বিভাগানুসারেই জীবেশ্বরাদি বিভাগ নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।"

অর্থাৎ, সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম মায়া-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বরসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, আর অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব-পদবাচ্য হইয়াছেন। মায়া স্বভাবতঃই শুদ্ধসত্ত্ব, সেই জন্য তৎপ্রতি-বিম্বিত ঈশ্বরও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এবং মায়াকে স্ববশে

রাখিয়া যথেচ্ছরূপে পরিচালিত করিতেছেন, আর তমঃপ্রধান অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত জীব অজ্ঞান বাহুল্য-বশতঃ অবিদ্যার অধীন হইয়া পরিচালিত হইতেছে; এবং অজ্ঞানের তারতম্যানুসারে দেবতির্য্যক্‌মনুষ্যাদিক্রমে অনন্ত বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে।

এখানে আর একটী কথা না বলিলে আমাদের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেইজন্য এখানে সেই কথাটী বলিয়া রাখা আবশ্যক। কথাটী এই,—

উপরে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা প্রতিবিম্ববাদের কথা। এতদতিরিক্ত আরও একটী বাদ আছে; তাহা 'অবচ্ছেদ-বাদ' নামে পরিচিত। একই আকাশ যেমন ঘটমধ্যে ঘটাকাশ, মঠমধ্যে মঠাকাশ, এবং আরও অনেক বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়; সেইরূপ পরব্রহ্মও পূর্ব্বোক্ত মায়া ও অবিদ্যার অভ্যন্তরে তদুভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইয়া ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞায় অভিহিত হন; সুতরাং মায়া হইতেছে ঈশ্বরের, আর অবিদ্যা হইতেছে জীবের অবচ্ছেদক। এই অবচ্ছেদ-কেরই অপর নাম উপাধি। * কেহ কেহ আবার উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। অতএব, তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—

* সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে 'উপাধি' ও 'অবচ্ছেদক' শব্দের প্রয়োগ অত্যধিক দৃষ্ট হয়। উপাধি ও অবচ্ছেদকের প্রধান কার্য্য হইতেছে, সাধারণ বস্তুকে বিশেষিত করা, এবং অপরিমিত বা মহৎবস্তুকে পরিমিতরূপে প্রদর্শন করা অথবা নির্ব্বিশেষ বস্তুতে সবিশেষভাব আরোপিত করা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহারা ঐ প্রকার ব্যবহার সম্পাদনে সহায়তা করে মাত্র, কিন্তু কোন বস্তুরই স্বাভাবিক অবস্থা ধ্বংস করিতে পারে না।

"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরীশ্বরঃ।"
অর্থাৎ, কারণীভূত মায়া হইতেছে—ঈশ্বরের উপাধি বা অবচ্ছেদক, আর মায়াকার্য্য বা মায়ার পরিণাম অন্তঃকরণ হইতেছে—জীবের উপাধি। ইঁহাদের মতে প্রকৃতির প্রাগুক্ত 'মায়া' 'অবিদ্যা' বিভাগের কোনই প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিই মায়া ও অবিদ্যা স্বতন্ত্র দুইটী নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনে উপরিউক্ত উভয় প্রকার মতেরই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার প্রথমে বলিয়াছেন,—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২)। পরে আবার প্রতিবিম্ববাদ সমর্থন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"আভাস এব চ।" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২)। এখানে প্রথম সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলায় অবচ্ছেদবাদে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। কারণ, অবচ্ছেদবাদেই জীবব্রহ্মের আংশাংশিভাব উপপন্ন হয়, প্রতিবিম্ববাদে নহে। প্রতিবিম্ব যে বিম্ববস্তুর অংশ নহে, ইহা যেমন যুক্তিসঙ্গত, তেমনই লোকব্যবহারসম্মতও বটে। সুতরাং প্রথম সূত্র যে প্রতিবিম্ববাদের প্রদর্শক নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, উল্লিখিত দ্বিতীয় সূত্রে যে প্রতিবিম্ববাদই সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। প্রতিবিম্ব আর আভাস বস্তুতঃ একই পদার্থ; সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রদ্বারা সূত্রকার প্রতিবিম্ববাদেরই সমর্থন করিয়াছেন বলিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে; "আভাস এব"—এই 'এব' শব্দের দ্বারা প্রতিবিম্ববাদের দিকেই সূত্রকারের আদরাতিশয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই কারণে অনেকেই মনে

করেন যে, প্রতিবিম্ববাদই সূত্রকারের অভিপ্রেতবাদ, আর অবচ্ছেদবাদটী কেবল সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তরূপে ব্রহ্মসূত্রে উপন্যস্ত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে উহা সূত্রকারের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নহে—ইত্যাদি। এরূপ কল্পনার অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তিও আছে; বিস্তৃতিভয়ে এখানে সে সকল কথার আলোচনা পরিত্যাগ করা হইল।

এখন দেখিতে হইবে যে, জীব সম্বন্ধে প্রতিবিম্ববাদই সত্য হউক আর অবচ্ছেদবাদই সত্য হউক, জীব যে অবিকৃত ব্রহ্মস্বরূপ, সে বিষয়ে আর মতভেদ নাই। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত নির্ব্বিকার ও নিঃসঙ্গ; সুতরাং তাঁহাতে সুখদুঃখময় সংসার-সম্বন্ধ কখনই সম্ভবপর হয় না। ব্রহ্মে যখন সাংসারিক সুখদুঃখ সম্ভবপর হয় না, তখন ব্রহ্মস্বরূপ জীবেও সুখদুঃখভোগ সম্ভবপর হইতে পারে না। অথচ জাগতিক জীবমাত্রই যে দেশ-কালনির্ব্বিশেষে সুখদুঃখের ভোগে সমধিক হর্ষবিষাদ অনুভব করিয়া থাকে, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। প্রত্যক্ষের অপলাপ করা প্রকৃতস্থ কোনও ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অঘটন সংঘটন হয় কিরূপে এবং কাহার প্রভাবে? তাহা না জানিলে বা না বুঝিলে জিজ্ঞাসুর কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না, এবং শাস্ত্রার্থেও শ্রদ্ধা বা অনুরাগ আসিতে পারে না; সুতরাং তদ্বিষয়ে কঠোর সাধনা স্বীকারেও আগ্রহ জন্মিতে পারে না। এই জন্য, যে কারণে ব্রহ্মস্বরূপ জীবেও সুখদুঃখ ভোগ এবং জন্মমরণ ও বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি অসম্ভব বিষয়ও সম্ভবপর হইয়া থাকে, অতঃপর তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

* * *

অবিদ্যার শক্তিদ্বয়।

পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মী-শক্তির কথা বলা হইয়াছে,—মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান প্রভৃতি যাহার নামান্তর,—সেই অবিদ্যার দুই প্রকার শক্তি আছে—এক আবরণ-শক্তি, অপর বিক্ষেপ-শক্তি। অবিদ্যা যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা যে বিষয়ে পতিত হয়, তদীয় আবরণ-শক্তি প্রথমতঃ সেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপটী আবৃত বা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, অর্থাৎ সেই বস্তুর প্রকৃত রূপটী দেখিতে দেয় না। পরে বিক্ষেপ-শক্তি ঐ আবৃত বস্তুটীর উপর অন্য প্রকার অসত্য আকৃতি ও নাম পরিকল্পনা করিয়া থাকে। তখনই লোকে বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া বিষম ভ্রান্তিজালে জড়িত হয়। অদ্বৈতবাদীর মতে সমস্ত জগৎটাই উক্ত উভয়বিধ অবিদ্যা-শক্তির বিলাস বলিয়া বিবেচিত হয়। জীবের সুখ দুঃখভোগও উক্ত অবিদ্যাশক্তিরই অপরিহার্য্য ফল বলিয়া জানিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন,—যে অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা-শক্তির প্রভাবে নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মও জীবভাব প্রাপ্ত হন, সেই অবিদ্যারই মহীয়সী শক্তির দ্বারা প্রথমতঃ জীবের ব্রহ্মভাব আবৃত হইয়া পড়ে; পরে নানাবিধ অবাস্তবভাব তাহাতে কল্পিত হইয়া ক্রমে বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম বা গুণসমূহ জীবে সমারোপিত করে। পক্ষান্তরে, জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মের জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মও বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া থাকে। তখন আর বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই না-বুঝারই নাম 'অবিবেক', অধ্যাস ও অবিদ্যা প্রভৃতি; এবং ইহারই মহিমায় জীব সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও

কখনও বা ক্ষণিক আনন্দের প্রত্যাশায় উচ্ছ্বসিত, কখনও বা অবাস্তব দুঃখভোগে নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"তামিমাম্ অবিবেকলক্ষণামবিদ্যাং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে লৌকিকা বৈদিকাশ্চ ব্যবহারাঃ প্রবৃত্তাঃ, সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি-প্রতিষেধ-মোক্ষ-পরাণি।" (বেদান্তদর্শন, অধ্যাসভাষ্য)।

অর্থাৎ,—উক্ত প্রকার অবিবেকাত্মক অবিদ্যাকে অগ্রসর করিয়াই যত-কিছু লোকব্যবহার ও বেদোক্ত ব্যবহার (যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান) প্রবৃত্ত হইয়াছে। অধিক কি, বিধি-নিষেধ ও মুক্তি প্রতিপাদক সমস্ত শাস্ত্রও এই অবিদ্যাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, লৌকিক ও বৈদিক যত প্রকার ব্যবহার আছে, এবং শাস্ত্রোক্ত যতপ্রকার বিধি-নিষেধ ও মোক্ষ-কথা আছে, সে সমুদয়ের মূল হইতেছে—অবিদ্যা বা অবিবেক; অবিবেক বিলুপ্ত হইলে, ঐ সকল বিষয়ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উল্লিখিত আচার্য্য-বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাগুপ্ত অবিবেক বা অবিদ্যাই যত অনর্থের মূল। অবিদ্যাই অসত্যে সত্যতা বুদ্ধি ও সত্যে অসত্যতা বুদ্ধি সমুৎপাদন করতঃ অচেতন-বুদ্ধিতে চেতন-ভ্রান্তি জন্মায়, আবার চেতন আত্মাতেও বুদ্ধিগত সুখদুঃখের সদ্ভাব আরোপ করায়। তাহার ফলে জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে লোকসিদ্ধ সুখদুঃখে অসংস্পৃষ্ট নিত্য আনন্দস্বরূপ হইয়াও আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি প্রকার মনে করে, এবং তৎ-পরিহারের নিমিত্ত সতত যত্নপর হইয়া থাকে।

জীব যতদিন এই অবিদ্যার অধীন হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকিবে,—আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন অসত্য হইলেও

উক্ত সংসার-সম্বন্ধ অপনীত হইবে না; পক্ষান্তরে যেই মুহূর্ত্তে সে আপনার স্বরূপ অবগত হইবে—উক্ত অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সৌরকিরণ-সংস্পর্শে নীহাররাশির ন্যায় তাহার সর্ব্ববিধ সংসারিভাব বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। তখন ছিন্নমূল সংসারতরু আর স্থিতিলাভ করিতে পারিবে না। ব্রহ্মবিদ্যাই জীবকে এ শুভসুযোগ প্রদান করিতে সমর্থ, অপর কেহ নহে। সেই জন্যই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে—বিশেষতঃ বেদান্তশাস্ত্রে—আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মবিদ্যার এত প্রশংসা ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

যে আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়, সেই আত্মজ্ঞান কি প্রকার, তাহা লাভ করিবার উপায় কি এবং অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর জীবাত্মা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়;—অতঃপর প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। আশা করি, তাহাতেই আমাদের বক্তব্য পরিসমাপ্ত হইবে।

আত্ম-জ্ঞান।

পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই যে আত্মার একমাত্র বন্ধন ও সমস্ত অনর্থের নিদান, এবং আত্মজ্ঞানই যে ঐ অবিদ্যা নিবৃত্তির উপায়, তাহাও সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। সেই আত্মজ্ঞান ও অবিদ্যা যে কি প্রকার, তাহা বলিতে বাকি আছে; এখন তাহাই বলা হইতেছে।

জ্ঞান সাধারণতঃ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার; অজ্ঞান বা অবিদ্যাও সেইরূপ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নামে কথিত হয়; আর

শব্দ ও অনুমানাদির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞান নামে পরিচিত। যেমন—চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন, কর্ণদ্বারা শব্দ-শ্রবণ, কিংবা জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন ইত্যাদি জ্ঞান অপরোক্ষ মধ্যে পরিগণিত; আর শব্দ-শ্রবণে যে অতীত ও দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞান, কিংবা অনুমানাদির সাহায্যে যে ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান-শ্রেণীর অন্তর্গত। জ্ঞান পরোক্ষই হউক আর অপরোক্ষই হউক, উভয় প্রকার জ্ঞানই ভ্রম-প্রমা-সাধারণ। জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতার ও অসত্যতার উপরে জ্ঞানের প্রমাত্ব (সত্যতা) ও ভ্রমত্ব (অসত্যতা) প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ বিজ্ঞাত বিষয় যথার্থ হইলে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে প্রমা আর বিজ্ঞাত বিষয়টা অসত্য হইলে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইবে অপ্রমা বা ভ্রম। এখন সে জ্ঞান পরোক্ষই হউক আর অপরোক্ষই হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। বেদান্ত-শাস্ত্রে উক্ত যথার্থ জ্ঞানই প্রমা, জ্ঞান ও বিদ্যা প্রভৃতি নামে, আর অযথার্থ-জ্ঞানই ভ্রম, অপ্রমা, অজ্ঞান ও অবিদ্যা প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরেও এরূপ ব্যবহার উপেক্ষিত হয় নাই। সে যাহা হউক, উল্লিখিত নিয়মে প্রমাণিত হইল যে, জ্ঞান যেমন পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার, তেমনই বিদ্যা ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) ভেদেও দুই প্রকার।

এখন প্রথমে দেখিতে হইবে যে, জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড অনন্ত নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপ হইয়াও যে আপনাকে তদ্বিপরীত-ভাবাপন্ন মনে করে—জানে, এ জ্ঞান পরোক্ষ কি অপরোক্ষ। এ জ্ঞান যখন শব্দ বা অনুমানাদি জনিত নহে—সুখদুঃখাদি জ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎ মানস (মনোজন্য), তখন নিশ্চয়ই এ জ্ঞানকে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভিন্ন পরোক্ষ বলিতে পারা যায়

না। * অথচ ঐ জ্ঞানটী প্রত্যক্ষাত্মক হইলেও অভ্রান্ত নহে; পর বিজ্ঞাত বস্তুর (আত্মার) প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া অন্যরূপ প্রকাশ করায়,—এই জন্য নিশ্চয়ই ভ্রম বা অজ্ঞান-পদবাচ্য। অধিকন্তু, উহা অজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক হইলেও অপরোক্ষত্ব নিবন্ধন শব্দ বা অনুমানাদি জন্য পরোক্ষ জ্ঞানাপেক্ষা প্রবল (বলবান্)। প্রবলকে বাধা দিবার শক্তি দুর্ব্বলের নাই; নাই বলিয়াই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে শত শত উপদেশ হইতে লব্ধ অভ্রান্ত জ্ঞানেও উহা অপনোদন করিতে পারা যায় না; ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ঐ প্রকার অপরোক্ষ ভ্রম নিবারণের নিমিত্ত তুল্যবল অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানের আবশ্যক হয়। অপরোক্ষ ভ্রম অপেক্ষা অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয়ই প্রবল; সুতরাং আত্ম-বিষয়ে অভ্রান্ত সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, তদপেক্ষা নিতান্ত দুর্ব্বল আত্মবিষয়ক ভ্রমাত্মক অজ্ঞান বা অবিদ্যা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া যায়। ইহা জ্ঞান-শাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত।

---

* নিজের সুখদুঃখের যে অনুভূতি, উহা কখনই পরোপদেশ-লব্ধ বা অনুমানগম্য নহে; সকলেই মনে মনে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই কারণেই আমার সুখ বা দুঃখ আছে কিনা, এরূপ সংশয় কাহারও হয় না। এইরূপ অনাত্মা-দেহাদিতে যে আত্মজ্ঞান বা অহং-বোধ, আর আত্মাতে যে সুখদুঃখাদিবোধ, তাহাও পরের উপদেশ পাইয়া কিংবা অনুমান করিয়া বুঝিতে হয় না। উহা এক প্রকার স্বাভাবিক জ্ঞান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং ঐ জ্ঞানকেও অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়াই উপদেশাদিলব্ধ তত্ত্বজ্ঞানেও উহার নিবৃত্তি হয় না।

অতএব যাহারা শান্তিময় মুক্তি-রস আস্বাদনে কৃতার্থ হইতে অভিলাষী, তাহাদের সর্ব্বাদৌ সর্ব্বানর্থ-প্রবর্ত্তক অজ্ঞান বা অবিদ্যা বিধ্বংসে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। আত্মবিষয়ে অভ্রান্ত অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ ব্যতীত যখন অবিদ্যা-ধ্বংস সম্ভবপরই হয় না; তখন মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সর্ব্বাদৌ জ্ঞান-সাধন সামগ্রী সংগ্রহেও তৎপর হইতে হয়; বিষয়-চিন্তানিরত সংসারী মানব আপনার অমার্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারা সে সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার জন্য অধ্যাত্মতত্ত্ব-প্রকাশক প্রামাণিক শাস্ত্র-বাক্যের সাহায্য লইতে হয়। যে সকল সাধন-সামগ্রী মোক্ষোপযোগী, আত্মজ্ঞানলাভের একান্ত সহায়, উপনিষদ্ ও আধ্যাত্ম-শাস্ত্রসমূহ সে সকল সাধনের পরিগণনা করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং সেই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সাধন-সামগ্রীর প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারি। এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।"

অর্থাৎ,—যিনি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিয়াছেন, সমস্ত ভোগ্য বিষয় হইতে বিরত হইয়াছেন, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, এবং চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ-সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ অধিকারী পুরুষ আপনাতেই আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা বলা হইল এই যে, আত্ম-দর্শন করিতে হইলে অগ্রে ঐ সকল গুণে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা স্বয়ং বেদব্যাসও "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" (১।১।১)—এই সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের দ্বারা ঐ সকল সাধনসামগ্রীর কথাই ধ্বনিত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও

ভাষ্য-মধ্যে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে 'অথ' শব্দ-সূচিত বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পদ্ ও মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা)। * এই কয়টীকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ঐকান্তিক সাধনা-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে উল্লিখিত সাধনসমূহ যাহার অধিগত বা আয়ত্ত হইয়াছে, সে লোক বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করুক বা নাই করুক, আত্মজিজ্ঞাসায় তাহার সম্পূর্ণ অধিকার হইবেই হইবে; পক্ষান্তরে ঐ সকল সাধনবিহীন লোক বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আত্ম-জিজ্ঞাসায় অধিকারী কখনই হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত বিবেক বৈরাগ্যাদি গুণগুলি অধিকার-প্রবর্ত্তক হইলেও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান-সমুৎপাদনে সমর্থ নহে; আত্ম-জ্ঞানের অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায় স্বতন্ত্র। সে

* "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বং চেতি। ... এষু চ সৎসু বেদাধ্যয়নাৎ প্রাগূর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজ্ঞাতুং জিজ্ঞাসিতুং চেতি (১।১।১)।

অর্থ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যপদার্থ, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। এইরূপ বিভাগ জ্ঞান—নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক। অনিত্য ও অল্পকালস্থায়ী মনে করিয়া যে ঐহিক ধনধান্যাদি ও পারলৌকিক স্বর্গাদি-ভোগে বিরক্তি, তাহাই ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ; শমদমাদিসাধন অর্থ—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা; মুমুক্ষুত্ব অর্থ—মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই চারি প্রকার সাধনের অভাবে যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, পক্ষান্তরে উহাদের সদ্ভাবেই হয়, তখন এই চারিটীই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অব্যভিচারী উপায় বা সাধন।

উপায় তিন ভাগে বিভক্ত—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামে অভিহিত। স্বয়ং শ্রুতিই উক্ত ত্রিবিধ উপায়কে আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যভিচারী উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।" এখানে শ্রুতি প্রথমতঃ আত্মদর্শনের জন্য আদেশ করিয়াছেন, পরে তাহার উপায়-রূপে দর্শন, শ্রবণ ও মননের বিধান দিয়াছেন। পুরাণ-শাস্ত্রও উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিবৃত করিয়া স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

অর্থাৎ,—বেদবাক্য হইতে প্রথমতঃ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবে, পরে সেই বিজ্ঞাত তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমুদয় সংশয় বা ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, উপযুক্ত যুক্তি-প্রয়োগে সে সমুদয় সংশয় ও ভ্রান্তি জ্ঞান অপনয়ন পূর্ব্বক শ্রুতার্থে দৃঢ়প্রত্যয় স্থাপন করিবে। অনন্তর সেই নিঃসংশয়িত শ্রুতি-বিষয়ে নিদিধ্যাসন করিবে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান বা চিন্তা করিবে। এই প্রকারে সম্পাদিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই আত্মদর্শনের উপায়। সর্ব্বত্রই 'আত্ম-দর্শন' শব্দের অর্থ আত্ম-সাক্ষাৎকার, কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান নহে।

উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্যে ও পুরাণ-বচনে যদিও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনই তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকুক, তথাপি *আচার্য্যগণ উক্ত তিনটী উপায়েরই তুল্য ক্ষমতা স্বীকার করেন নাই*; এবং সে বিষয়ে সকলে একমতও হইতে পারেন নাই।

কেহ বলিয়াছেন—

"তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্।"

অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য শ্রবণে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়,

তাহাই মুক্তির কারণ। এ কথায় তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক শ্রুতিবাক্যের শ্রবণই (শ্রবণ জন্য জ্ঞানই) প্রকৃতপক্ষে মুক্তি (আত্মসাক্ষাৎকার) জন্মায়, মনন ও নিদিধ্যাসন উহার সাহায্য করে মাত্র। অপর সম্প্রদায় আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বলেন যে, নিদিধ্যাসনই সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়; শ্রবণ ও মনন তাহার সাহায্য করিয়া থাকে মাত্র। যোগশাস্ত্রও এ কথা অনুমোদন করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে কাহার মত সত্য, আর কাহার মত মিথ্যা, এবং কোন্ পক্ষ গ্রাহ্য আর কোন্ পক্ষ ত্যাজ্য, সে কথা আমাদের আলোচ্য নহে। মুমুক্ষুগণ সাধনপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, নিজেরাই উক্ত উভয় মতের উৎকর্ষাপকর্ষ অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে অপরের সম্মতি-গ্রহণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে যখন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনই অনুপেক্ষণীয়, তখন অগ্রে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বৃথা সময়ক্ষেপ ও শক্তিক্ষয় করা কখনই সঙ্গত নহে। এই জন্য আমরাও এই কথা এখানেই সমাপ্ত করিয়া জীবের চরম লক্ষ্য মুক্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিতে ইচ্ছা করি।

* * *

মুক্তি।

দুঃখ যেমন প্রাণীমাত্রেরই অপ্রিয় ও অপ্রার্থনীয়, মুক্তি আবার তেমনি সকল প্রাণীর একান্ত প্রিয় ও প্রার্থনীয়। মুক্তির অর্থ—সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক উপশম বা নিবৃত্তি। দুঃখের নিবৃত্তি চাহে না, এরূপ লোক জগতে নাই। অন্যান্য বিষয়ে লোকের যতই মতভেদ থাকুক না কেন, দুঃখনিবৃত্তির উপাদেয়তা সম্বন্ধে

কাহারও মতান্তর দেখা যায় না। দুঃখ-নিবৃত্তির ন্যায় অবিসংবাদিত প্রিয়, জগতে আর কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিক কি, অত্যন্ত ভিন্নপথগামী স্বস্ব সিদ্ধান্তের সমর্থনের জন্য পরস্পর বিবাদমান ঋষিবর্গ ও আচার্য্যগণ অন্যান্য বিষয়ে বিরুদ্ধবাদী হইলেও দুঃখনিবৃত্তির উপাদেয়তা সম্বন্ধে সকলেই একমত হইয়া কথা বলিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানই যে সেই দুঃখ-নিবৃত্তির নিদান, এ কথাতেও প্রায় সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, অজ্ঞানই জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ-ভোগের নিদান। সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতিরেকে দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব হয় না; এবং অপরোক্ষ জ্ঞানই যে, অজ্ঞানের একমাত্র বিরোধী, এ কথাও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং জ্ঞানলাভ না হইলে সেই দুঃখ-মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আত্ম-জ্ঞানে অধিকারী পুরুষ যে প্রকার উপাসনার দ্বারা আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, সেই উপাসনা কিরূপ, কত প্রকার, এবং তৎসম্পাদিত মুক্তি ও তাহার প্রভেদ কত প্রকার, এই কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিলেই আমাদের বক্তব্যগুলি পরিসমাপ্ত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে নিদিধ্যাসনের কথা বলা হইয়াছে, সেই নিদিধ্যাসনের অপর নাম—উপাসনা। বেদান্তমতে উপাসনা তিন প্রকার—(১) সম্পদুপাসনা, (২) প্রতীকোপাসনা এবং (৩) অহংগ্রহোপাসনা। তন্মধ্যে কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর কোনপ্রকার গুণসম্পদ্ দেখিয়া যে তদপেক্ষা হীনবস্তুকে সেই উৎকৃষ্ট বস্তু মনে করিয়া উপাসনা (চিন্তা),

তাহার নাম—সম্পদুপাসনা। আর কোনও একটী উৎকৃষ্ট বস্তুর কোনও একটী (নামরূপাদি) চিহ্নবিশেষকে সেই উৎকৃষ্ট বস্তুবোধে উপাসনা, তাহার নাম—প্রতীকোপাসনা। আর উপাস্য বস্তুকে অহংবুদ্ধিতে অর্থাৎ নিজের সহিত অভেদবুদ্ধিতে যে উপাসনা,—তাহার নাম অহংগ্রহোপাসনা (যেমন উপাস্য ব্রহ্মের অহংভাবে উপাসনা)। এস্থলে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে অতিঅল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

উক্ত ত্রিবিধ উপাসনার মধ্যে অহংগ্রহোপাসনাই আত্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গসাধন, আর অপর দুইটী তাহার বহিরঙ্গসাধন। প্রথমে বিষয়ানুরক্ত মন উপাস্যের অপূর্ব্ব মহিমা ভাবনা করিতে করিতে বিষয়-প্রীতি ভুলিয়া যায়, কিন্তু তখনও বহু বিভূতি ভাবনার ফলে মনের বিক্ষেপ বা চঞ্চলতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় না। সেই বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্য প্রতীক উপাসনায় মনোযোগ করিতে হয়। প্রতীকে ভাবনীয় বিষয়ের বাহুল্য থাকে না; সুতরাং বিক্ষেপ বৃদ্ধিরও ভয় থাকে না; বরং বিক্ষেপের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া মনেতে প্রশান্তভাব আনয়ন করে। তদবস্থায় বিশুদ্ধ মন উপাস্য ব্রহ্মবস্তুর সহিত আত্মার অভেদ চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ অহংগ্রহোপাসনারই পরিণামে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা জীব-ব্রহ্মের অভিন্নভাব প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। এবংবিধ সাক্ষাৎ-কারেই জীবের কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। তখন জীবের আর কিছু করণীয় থাকে না। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—“ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”; তখন জীবের জীবভাব ঘুচিয়া যায় এবং ব্রহ্মভাব ফুটিয়া উঠে। সংসারের ত্রিতাপজ্বালা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, এবং ভবিষ্যতের ভাবনাও থাকে

না। ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়—তিনি মুক্তির শান্তিময় ক্রোড়ে চিরদিনের তরে বিশ্রামলাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

উপরে যে মুক্তির কথা বলা হইল, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। যাঁহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া যথাবিধি শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করতঃ এই দেহে থাকিয়া, জীবদবস্থায়ই আত্মার ব্রহ্মভাব দর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। তাঁহাদের মুক্তিকে জীবন্মুক্তিনামে অভিহিত করা হয়; আর যাঁহারা উপযুক্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এবং দীর্ঘকাল শ্রবণাদি সাধনের অনুশীলন করিয়াও জীবদবস্থায় ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারাও দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসজ সংস্কারবশে মৃত্যুসময়ে ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করেন; তখন তাঁহারা ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। সুতরাং তাঁহাদের আর লোকান্তরে গতি হয় না; এখানেই তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ বিশীর্ণ হইয়া পঞ্চভূতে মিলিয়া যায়। ফলে জীব তখন বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতে মিশিয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ইহৈব সমবনীয়ন্তে, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"—সেই উপাসকের প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ বাহিরে লোকান্তরে চলিয়া যায় না। এখানেই স্বস্ব কারণে বিলীন হয়। তিনি পূর্ব্বেই বন্ধন-মুক্ত ছিলেন, এখন কেবল দেহমুক্ত হইলেন মাত্র। এইরূপে দেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়, কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না।

জীবন্মুক্তেরও মৃত্যুকালীন অবস্থা এতদনুরূপ। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় রত থাকিয়া স্বরূপ সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের অবস্থা অন্য প্রকার। তাঁহারা

দেহ-ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে (চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোকে) গমন করেন। সেখানে যাইয়া ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহারও জ্ঞানসাধনে রত হন, এবং সেই সাধনার ফলে আত্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকার লাভ করেন। পরে যখন সেই ব্রহ্মার কার্য্যকাল পরিপূর্ণ হয়, তখন—

"ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

সেই সমুদয় ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষ, আত্মসাক্ষাৎকারে কৃতকার্য্য হইয়া সেখানেই অবস্থান করেন। পরে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, ব্রহ্মার আরব্ধ অধিকার পরিসমাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মলোকবাসী সেই সকল জ্ঞানী পুরুষও পরমাত্মায় বিলীন হইয়া চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহাদের আর ঘোর সংসারে আসিতে হয় না। এখানেই তাঁহাদের সংসার-নাট্যের যবনিকা পতন হয়, শান্তিময় চিরবিশ্রাম লাভ হয়। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ॥"

শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ॥